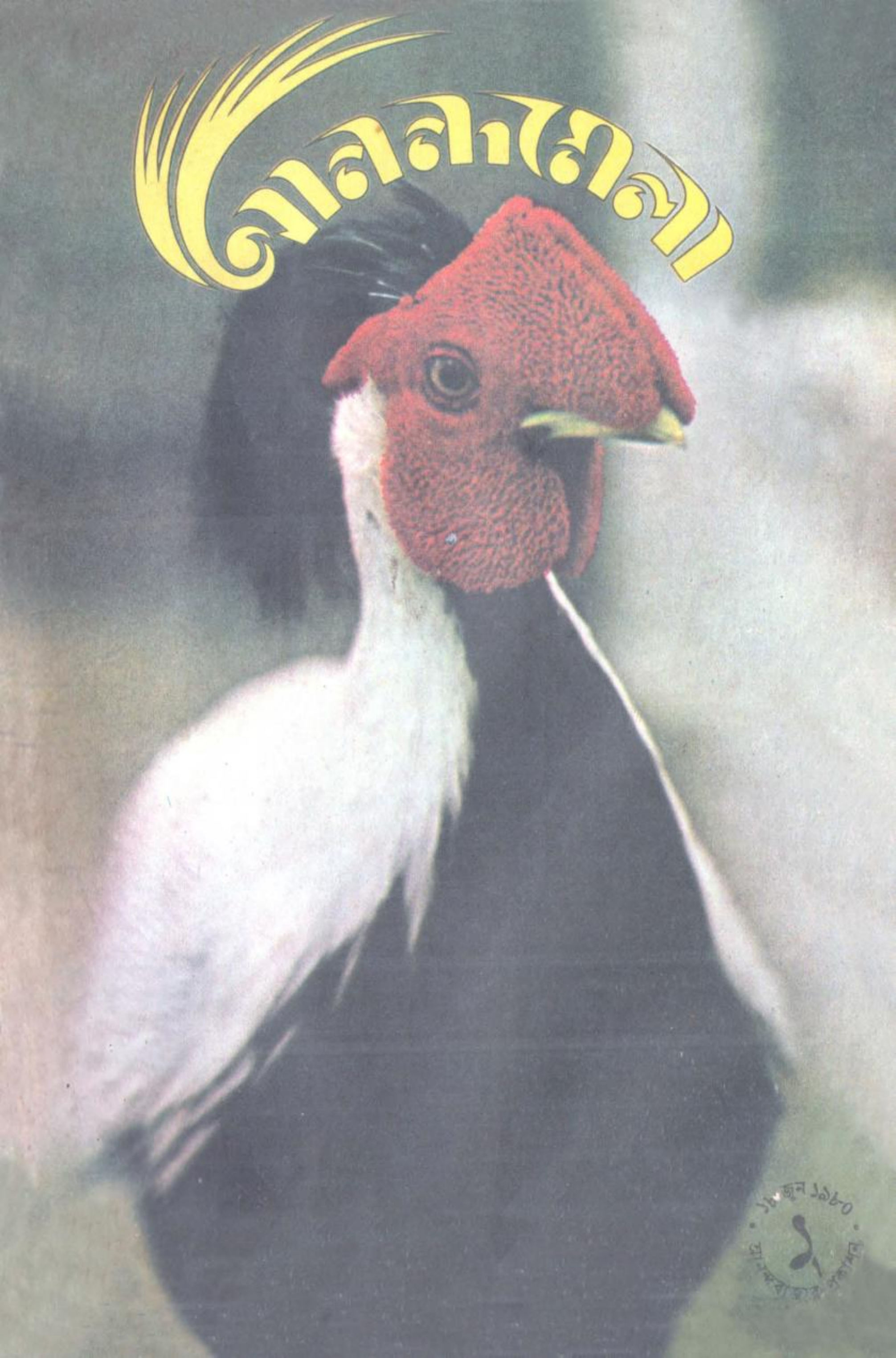
আনন্দমেলা
১৮ জুন ১৯৮০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি দিয়েছেন - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, সোমনাথ দাসগুপ্ত

স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লীতে একটি বিশেষ উপাদান আছে যা ত্বকের ভেতরে গিয়ে স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে,আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে...

অথচ আপনার ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে। ৬ সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে !

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী– ফর্সা হবার কোমল উপায়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-FALOV.10-172 BG

আনন্দমেলা

৪ আষাঢ় ১৩৮৭ • ১৮ জুন ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ৫ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

ষাঁড়ের লড়াই। শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ৪

আমিও দেখেছি। সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ৮

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১০

উপন্যাস

কে। বিমল মিত্র ২৭

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬

গল্প

সতুদের রহস্যভেদ। আশিস বর্মণ ১৪

ক্লোরোফর্ম টর্চ। সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৩১

ভ্রমণ-কাহিনী

হংকংয়ের গল্প। কৃষ্ণা বসু ৪৫

ছড়া

পিপলু ও অলিম্পিক। অশোককুমার মিত্র ৩৩

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

সদাশিব ২০, রোভার্সের রয় ২২, টিনটিন ২৪

টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া

ভাষার খেলা। কুন্তক ৫৭

সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৫৯

যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৬২

খেলাধুলো

নাজিবের কথা। বজ্রসেন ৪৯

২000 সালের ক্রিকেট টীম। অশোক রায় ৫১

হরতনোর প্রত্যাবর্তন। অলোক দাশগুপ্ত ৫৩

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৪২

তোমাদের পাতা ৪৩,

নাজিবের রঙিন ছবি ৪৯

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাণ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

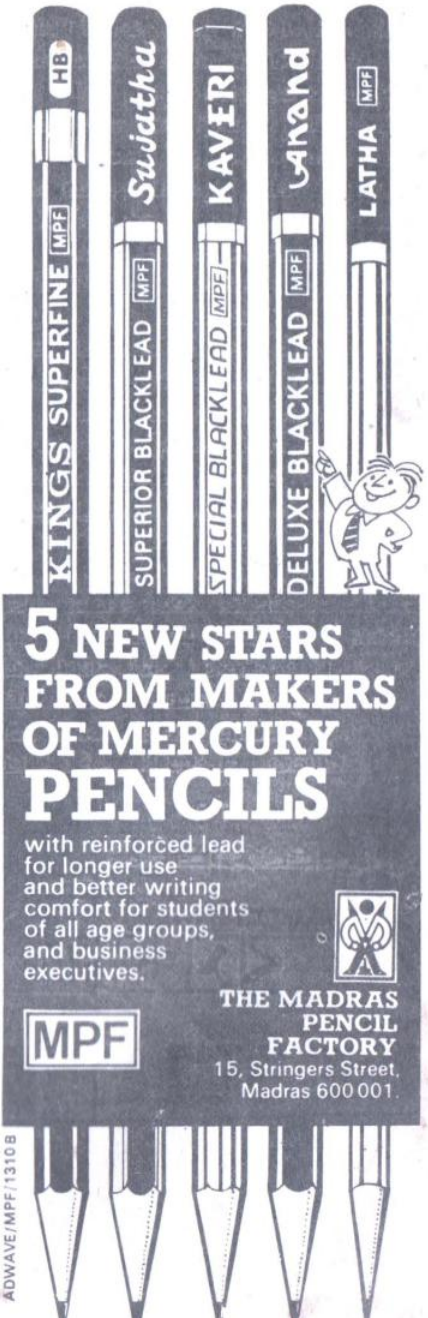

ষাঁড়ের লড়াই

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

রাগে গরগর করছে ষাঁড়টা। কালো কুচকুচে বিপুল শক্তির ষাঁড়টা যতই রাগে ফুঁসছে, ততই তার দেহের বিভিন্ন পেশীতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। থেকে থেকে সে পিছনের পা দিয়ে মাদ্রিদের জমকালো বুলফাইট রিঙের ধুলো ছেটাচ্ছে। সে এখন রাগে অন্ধ।

এই ষাঁড় এবং মাতাদোরের লড়াই, যাকে সাধারণভাবে বলা হয় বুলফাইট (স্পেনের নিজস্ব ভাষায় 'কোরিদা'), স্প্যানিশ জীবনে নিছক ক্রীড়া নয়। সাধারণত উৎসবের দিনে এই খেলা হয়ে থাকলেও বুলফাইট উৎসবেরও অধিক কিছু। আমাদের জীবনে চড়কপুজোর খেলাগুলোর সঙ্গেও বুঝি এর তুলনা চলে না। সাক্ষাৎ কালী-পুজো কিংবা দুর্গা-পুজোর স্তরে পোঁছে গেছে স্পেনের বুলফাইট। বুলফাইট স্পেনের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। বুলফাইট স্পেনের জীবনের আনন্দ এবং প্রাণস্ফূর্তির অভিব্যক্তি। সম্ভবত এই একটি মাত্র খেলা দিয়েই স্পেনের সত্তাকে উদ্ভাসিত করা যায়।

লাল চাদর (যাকে বুলফাইটের নিজস্ব ভাষায় বলা হয় 'মুলেতা') হাতে মাতাদোর রিঙে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু উন্মত্ত ষাঁড় তাঁর দিকে ধেয়ে গেল না। অজস্র রক্তপাতে এই সাড়ে চার বছর বয়সি পাঁচশো কিলো ওজনের ষাঁড়টির গতি কিছু মন্থর হয়ে গেছে। তার ঘাড় কিছুটা নুয়ে পড়েছে; গত দশ মিনিটে পিকাদোর এবং বান্দেরিল্লেরদের হাতে তার বেশ হেনস্তা হয়েছে। পিকাদোরের ঘোড়াকে সে বেশ ক'বার তার লম্বা, ছুঁচলো শিং দিয়ে বিদ্ধ করেছে। রাগের প্রাথমিক আবেগে সে অসংখ্যবার সামনের ঘোড়া এবং মানুষগুলোর দিকে ছুটে গেছে। কিন্তু রাগের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে সে কিছুটা সংযত।

ক্রমে ধীর পদক্ষেপে মাতাদোরই এগোলেন তাঁর প্রতিপক্ষের দিকে। সহসা একটা তীব্র চিৎকার এবং হাতের ঝটকায় তিনি ষাঁড়ের শান্তিভঙ্গ করলেন। অন্ধের মতন ধেয়ে গেল ষাঁড় লাল চাদরটার উদ্দেশে। প্রায় ব্যালে নাচের নিখুঁত ভঙ্গিতে মাতাদোর তাঁর চাদর উড়িয়ে নিলেন। ষাঁড়ও তার ভুল বুঝল আরও দশ-বার ফুট দূরে পোঁছে। হাতের এই মুলেতার খেলাকে বলা হয় পাস। একজন মাতাদোরের কলানৈপুণ্য ধরা পড়ে এই পাস বা ভেলকিতে। তিনি যেন অবলীলায় খেলা করেন তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে। সময়ে সময়ে চাদরের আলতো প্রলেপে মুছিয়ে দেন ষাঁড়ের কপালে রক্ত কিংবা ঘাম। এবং সেও ওই নিখুঁত পাসের অবসরে। যে

পিকাদোর এসে খেপিয়ে তুলছেন ষাঁড়কে

বুলফাইটের স্টেডিয়াম

পাসের দ্বারা তিনি এই করুণার কাজটুকু করেন স্প্যানিশে তার একটা অপূর্ব, কাব্যিক নাম আছে—ভেরোনিকা। স্পেনের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাতাদোর দোমিঙ্গো অর্তেগা ছিলেন এই ভেরোনিকা পাসের অমর শিল্পী। অপরজন ছিলেন ইগনাচিও সানচেজ মেহিয়াস। মেহিয়াস পারতপক্ষে বুলফাইটিংকে ব্যালে নৃত্যের স্তরে তুলে নিয়েছিলেন। এবং ১৯৩৪ সালের এক বিষণ্ণ বিকেলে এরকম

ষাঁড়ের গায়ে আঘাত হানছেন বান্দেরিলা

এক নৃত্যময় লড়াইয়ে প্রাণ দেন ষাঁড়ের শিঙে ভীষণভাবে বিদ্ধ হয়ে।

আস্তে আস্তে লড়াই জমে উঠেছে। আমাদের মাতাদোর ক্রমান্বয়ে মাতাল করে তুলছেন তাঁর ষাঁড়কে। এক এক পাসে হয়রান করে ফেলছেন পাগল জন্তুটাকে। থেকে থেকে চাদরের দুই, তিন কিংবা চার প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলেছেন তাকে। এবং এই খেলা চলছে নিরন্তর। কখনো কখনো ষাঁড়ের শিং মাতাদোরের বুক কিংবা ঊরু ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। যে-কোনো ভুলে তিনি আহত হতে পারেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর শরীরে ভয় বলে কোনো পদার্থ নেই। তিনি এক সময় প্রায় অজ্ঞতার ভঙ্গিতেই ষাঁড়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। সম্ভবত এটিও কোন বিচিত্র পাসের প্রথম ভঙ্গি। ক্লান্ত ষাঁড় কিন্তু এই সুযোগে আর ধেয়ে গেল না।

এরপর আবার এক সিরিজের পাস শুরু হল। এবং এক সময় মাতাদোর তাঁর মুলেতাকে রাজার সামনে কার্পেট পেতে দেবার ভঙ্গিতে বিছিয়ে দিলেন ষাঁড়ের সামনে। ষাঁড় তেড়ে গেল, মাতাদোর আলতো ভাবে হাত বদল করে চাদরটা তাঁর বাঁ হাতে নিয়ে নিলেন। ষাঁড় চাদর পেরিয়ে গিয়ে ছুটে এল ফের পিছনে। মাতাদোর আলতো ভাবে চাদরের ইশারায় ষাঁড়কে তাঁর শরীরের খুব কাছ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেলেন। এবং এক নাচের ভঙ্গিতেই প্রায় ডান হাতের

তরোয়ালটা অব্যর্থভাবে ষাঁড়ের ঘাড়ের পেশীর পিছনটায় বিদ্যুতের মতন বিঁধিয়ে দিলেন।

যুগ যুগ ধরে স্পেনের এই খেলা স্প্যানিশ এবং বিদেশী কবি, শিল্পী, লেখকদের মুগ্ধ করে এসেছে। স্প্যানিশ রাজন্যদের এই খেলা ক্রমেই জনতার মধ্যে নেমে এসেছে। অবশেষে এক সময় স্পেনীয় লোকাচারেও এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

বুলফাইট নিয়ে ছবির কথা ভাবতে গেলেই মনে আসে পাশ্চাত্য শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা গোইয়াকে। গোইয়া স্পেনের মানুষ। স্পেনের ক্ল্যাসিক শিল্পকলার তিন শ্রেষ্ঠের একজন তিনি। অন্য দুজন হলেন ভেলাসকেজ এবং এল গ্রেকো। কিন্তু গোইয়াকে আধুনিক যুগের হোতা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। স্পেনে বহু শিল্পীর সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম গোইয়া তাঁদের প্রাণের মানুষ। এবং এই গোইয়া তাঁর জীবনের প্রথম দিকে বুলরিঙে সহকারীর কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিচিত্র সব ড্রইংয়ে তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন বুলফাইটের ওই বিস্ময়কর জগৎকে। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই শতাব্দীতে বুলফাইট নিয়ে দারুণ দারুণ ছবি এঁকেছেন শিল্পী পিকাসো।

গদ্যের জগতেও বুলফাইটিংয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক। সেখানে দেখতে পাই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে। বুলফাইট বলতে পাগল ছিলেন হেমিংওয়ে। বুলফাইট নিয়ে তাঁর রচনার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। তিনি বাস্তবিক ভালবেসেছিলেন এই খেলাটিকে।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম যখন বুলফাইটের চল হয় স্পেনে তখন মাতাদোররা ঘোড়ায় চেপে লড়াই করতেন ষাঁড়ের সঙ্গে। অবশেষে একদিনের একটা দুর্ঘটনা থেকেই বর্তমান রীতির বুলফাইটের জন্ম হয়। ষাঁড়ের আঘাতে হঠাৎ এক সময় ঘোড়সওয়ার ভূপাতিত হন, এবং সমস্ত দর্শক শিউরে ওঠে মাতাদোরের করুণ বিপন্ন অবস্থা দেখে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই রিঙের এক সহকারী রঙিন চাদর দেখিয়ে দেখিয়ে ক্রুদ্ধ ষাঁড়কে রিঙের অন্যত্র নিয়ে হাজির করে। মানুষের কাছে সেদিন অশ্ববিহীন ওই সহকারী মানুষটি এবং ষাঁড়ের ওই খেলা অনেক বেশি ভাল লেগেছিল। ক্রমে দিনকে দিন এ-ও প্রতিপন্ন হল যে নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানুষ এবং ষাঁড়ের মুখোমুখি হওয়াটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।

শোনা যায় যে, স্পেনের রাজন্যরা ঘোড়ায় চেপে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তেন নিজেদের রণনৈপুণ্য বজায় রাখতে। ষোড়শ শতাব্দীর ওই পর্যায়ে স্পেনে যুদ্ধবিগ্রহ রীতিমতন কমে এসেছিল। স্পেনের ক্ষাত্রকুলের দুর্ভাবনা সেটাই ছিল। যুদ্ধের অভাবে বুঝিবা তাঁরা যুদ্ধশাস্ত্রই ভুলে বসেন! অতঃপর ক্রীড়াচ্ছলে এই ছিল তাঁদের ক্ষাত্রধর্ম পালন। তবে স্পেনে বুলরিঙের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, রনডা শহরে। স্পেনের প্রাচীনতম এই রনডা বুলরিঙ আজও টিকে আছে। তার বিচিত্র বারোক কারুকার্যের স্বাদ আজও মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করে। এর পর দাবানলের মতন বুলফাইট ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্পেনে। দেখতে দেখতে বুলরিং তৈরি হয় মাদ্রিদ, সেভিল, মালাগা এবং বার্সিলোনা শহরে। স্পেনের প্রায় সব ছোট-বড় শহরেই এখন বুলফাইটিংয়ের রেওয়াজ দেখা যায়। তবে চারশো বছরের পুরনো এই খেলা এখন প্রায় বিদেশীদের মনোরঞ্জনের জন্যই টিকে আছে। এমনিতে স্পেনে জিনিসপত্রের দাম বেশ কম হলেও লড়াইয়ের ষাঁড়ের দাম সমানে বেড়ে চলেছে। এক এক দিনের লড়াইয়ে ছ' ছ'টা ষাঁড় মারা পড়ে। যে-সব ষাঁড়ের একটারই দাম ১৫,০০০ ডলার! এছাড়া এক একজন নামী মাতাদোর একটা লড়াইয়ের জন্যই ১৫,০০০ ডলার পেয়ে থাকেন। এর পর তো অন্যান্য বহুরকম খরচ আছেই। এবং এই সব কারণেই আজকাল বুলফাইট দেখার

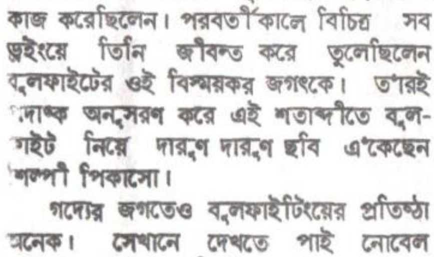

ক্রুদ্ধ ষাঁড় ছুটে আসছে

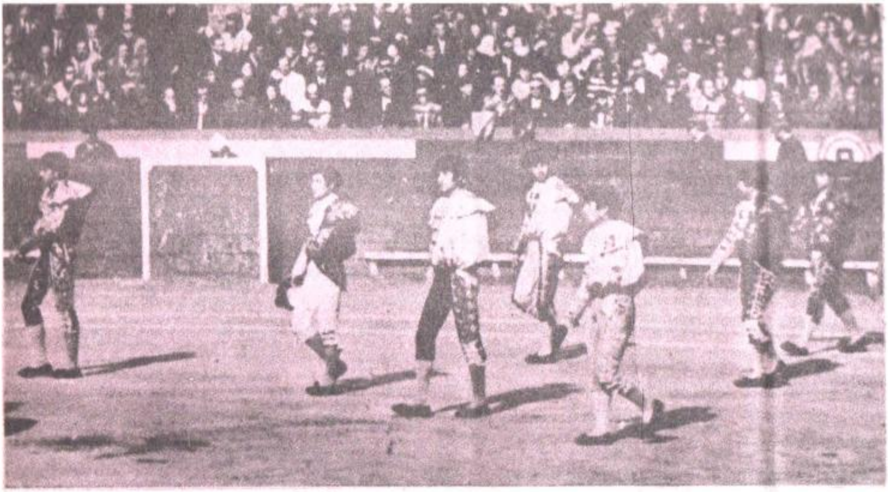

স্টেডিয়ামে ঢ্কছেন পিকাদোর-বাহিনী

খরচও বেশ বেড়ে গেছে। সব চেয়ে কম দামের সীটের জন্যই দশ, বারো ডলার লাগে। উঁচু দামগ্লো নাই-বা বললাম।

কিন্তু সমস্ত অস্বিধে সত্ত্বেও স্পেনে কোনোদিন ব্লফাইটের ম্ত্যু হবে না। কারণ স্পেনের প্রতিটি নতুন প্রজন্মের কাছে ব্লফাইটের একটা স্বতন্ত্র ম্ল্য আছে। এছাড়া স্পেন ইউরোপের সেরকমই একটা দেশ যেখানে আধ্নিকতার উগ্র তান্ডবে প্রনো ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় না। গোটা স্পেন ঘ্রেই আমার এই ধারণা হয়েছে। প্রনো এবং নতুনের এত স্ন্দর, নির্পদ্রব সহাবস্থান খ্ব বেশি দেশে আছে বলে মনে হয় না। স্পেনের প্রনো জিনিসের মধ্যে ব্লফাইটের স্থান খ্বই উঁচুতে। স্পেনের মান্ষের রক্তের মধ্যেই ব্লফাইট। এবং ব্ল-ফাইটের বোঝদার মহলের সামাজিক কদরও খ্ব বেশি। বিদেশী পর্যটকদের মতন স্রেফ হল্লাবাজি করতে তাঁরা রিঙে যান না। তাই বড় বড় শহরে এই সমঝদাররা লড়াই দেখে আনন্দ পান না। তাঁরা ছোটেন ছোট-ছোট শহরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে। যেখানে এক একদিন এক একটা ঐতিহাসিক লড়াইয়ের মাধ্যমে নতুন কোনো তারকার জন্ম হয়। যেমন ভাবে বহ্কাল আগে ভূপাতিত অশ্বারোহীকে রক্ষা করার জন্য শ্ধ্ চাদর হাতেই মাঠে নেমেছিলেন এক অজ্ঞাতকুলশীল সহকারী। কালক্রমে যিনি ব্লফাইটের জগতে প্রাতঃস্মরণীয় প্র্ষ হিসেবে গণ্য হন। তাঁর নাম ফ্রানচিসকো রোমেরো।

ইদানীং রামন কারান্দে নামের এক ব্লফাইট-বিশারদ একটা অসামান্য কাজ করেছেন। তিনি বহ্কাল গবেষণা করে সেই ১৭৪৭ সন থেকে ১৯৬২ সন অবধি স্পেনের বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় লড়াইয়ে নিহত মাতাদোরদের নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তাঁর হিসেব মতন এই এতগ্লো বছরে সত্যিকারের পেশাদারি এবং বড় লড়াইয়ে মাতাদোর মারা পড়েছেন ৪০৬ জন। এছাড়া ছোটখাট লড়াইয়ে, ট্রেনিং কিংবা রিহার্সাল এবং দ্র্ঘটনায় যে কত হাজার লোক মারা গেছেন তা হিসেবের বাইরে। এবং তিনি এও জানিয়েছেন যে, পেশাদারি লড়াইয়ে প্রায় ২২৫ বছরে সব চেয়ে বেশি মাতাদোর মারা গেছেন মাদ্রিদের রিঙে—৪৫ জন।

ব্লফাইট কবিতা ছাড়াও প্রভাবিত করেছে স্পেনের সঙ্গীতকে। নাচ এবং গান দিয়ে ব্লফাইটের আবহ স্ষ্টি করা হয়। দ্রুতলয়ের, নাচুনে ছন্দের এই সঙ্গীতকে স্প্যানিশে বলা হয় 'পাসাদোবল'।

ব্লফাইটের জন্য প্রয়োজন প্রখর রৌদ্র-কিরণ! স্র্যের বিভাস ছাড়া ব্লফাইট কিছ্তেই প্রাণ পেতে পারে না। স্র্যের তেজ, মাতাদোরের বীরত্ব এবং ষাঁড়ের ক্রোধ মিলে-মিশেই ব্লফাইটের আসর জমিয়ে তোলে। একটা মেঘাচ্ছন্ন দিনে যা কখনও সম্ভব নয়।

লাল কাপড় হাতে মাতাদোরের একটি কঠিন পাস

আমিও দেখেছি

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার স্কুলের ছাত্র সুদীপ্তও স্পেনে গিয়ে বুলফাইট দেখেছে। এবারে-তার অভিজ্ঞতার কথা শোনো।

গত বছর আমরা কয়েকজন বন্ধু স্কুলের চারজন শিক্ষকের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলাম। বহু দেশ দেখেছি, কিন্তু অল্প কথায় কী আর বলব, তাই একটি বিশেষ 'দেখা'ই কেবল তুলে ধরছি।

পর্তুগাল ও ইতালির প্রতিবেশী রাজ্য স্পেন। ইউরোপ যেখানে আফ্রিকাকে ছুঁই-ছুঁই করছে সেখানেই এই দেশ। এখান থেকেই জাহাজ নিয়ে কলম্বাস আমেরিকার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। ইতালির চারটি শহর দেখে আমরা এলাম সেই স্পেনে।

বুলফাইট স্পেনের জাতীয় খেলা। এমনকী মেক্সিকো এবং পর্তুগালেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক হল, পরদিন বিকেলে বুলফাইট দেখতে যাওয়া হবে। পরদিন সকালে আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে আমার ইতালিয়ান লিরা (ওখানকার পয়সা) স্প্যানিশ 'পয়সা পেসেতায় বদলে নিলাম। খুঁজতে বেরোলাম বুলফাইটের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড কনকনে ঠান্ডায়। পেয়েও গেলাম খানকয়েক। ছবিগুলো দেখে বেশ রোমাঞ্চ হল।

দেখতে না দেখতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। মনে হল, ভগবান যেন আমারই জন্যে সময়ের গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। মাস্টারমশায় বললেন, ''চটপট তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব।'' আমি দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নীচে নেমে লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘড়িতে তখন সন্ধে ছটা। কিন্তু আকাশে চড়া রোদ। মাদ্রিদে সূর্যাস্ত হয় রাত সাড়ে ন'টায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের টুরিস্ট বাস এসে গেল। আমরা রওনা হলাম পৌনে সাতটা নাগাদ, আমরা ৩৭ জন পৌঁছুলাম Plaza de Toros-এ। বিরাট এক বুল-রিং, দেখলেই বোঝা যায় খুব পুরনো, অনেকটা রোমান ধাঁচে তৈরি।

সাতটা পাঁচে দুজন অশ্বারোহী রিংয়ে ঢুকলেন। দুজনেরই পরনে লাল পোশাক। লাল দুটো ঘোড়ার পেটের ওপর লোহার বর্ম, পিঠে গদি। লাল রঙ দেখলে ষাঁড় খেপে যায়, তাই এত লালের ছড়াছড়ি। এদের বলে পিকাদোর।

এরপর গোলাপি কাপড় হাতে সোনালি পোশাক পরে চারজন রিঙে ঢুকলেন। এঁরা তরেদোর। এই দুই দলের আসল যোদ্ধা। মাতাদোরের সহকারী। দু'দলই ষাঁড়কে আহত করে আরও রাগিয়ে তোলে। তরেদোরদের হাতে থাকে কতগুলো বিশেষ ধরনের ছোট বর্শা, যেগুলো ছুঁড়ে মেরে ষাঁড়ের পিঠে গেঁথে দেওয়া হয়।

শুরু হল বুলফাইট। প্রথমেই ষাঁড়টাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে তরেদোররা গোলাপি কাপড় দোলাতে লাগলেন। ষাঁড় রেগে ছুটে গিয়ে ওই কাপড়টাকেই গুঁতোতে গেল আর সেই ফাঁকে তিন-চারটে বর্শা তার পিঠে ছুঁড়ে মারা হল। দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। আমাদের দলে যে কজন মহিলা ছিলেন তাঁরা হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন। সত্যি বলতে কি, আমারও চোখ টনটন করে উঠল। ষাঁড়টার ঘাড় থেকে রক্ত পড়তে লাগল দরদর করে।

বেশ কয়েকবার এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তারপর একে-একে পিকাদোররা এগিয়ে এলেন। ষাঁড়টা তাঁদের লাল পোশাক দেখে তেড়ে এসে লোহার বর্মে গুঁতো মারতে লাগল। এই ফাঁকে অশ্বারোহী ষাঁড়ের ঘাড়ে বিরাট লম্বা এক বর্শা দিয়ে খোঁচা মারতে লাগলেন। আহত জানোয়ার খেপে গেল আরও।

এমন সময় রিঙে প্রবেশ করলেন মাতাদোর। ধীরে ধীরে পিকাদোর ও তরেদোররা বিদায় নিলেন। রিঙে রইল শুধু জানোয়ার এবং লাল কাপড় ও ধারালো তলোয়ার হাতে মাতাদোর।

মাতাদোর দু' একবার কাপড়টা দোলাতেই ষাঁড়টা নতুন শক্তি নিয়ে তেড়ে এল। মাতাদোর সরে গেলেন এক লাফে। ষাঁড়টা ব্যর্থ হয়ে আরও জোরে তেড়ে গেল। মাতাদোর আবার কায়দা করে সরে গেলেন। বার-পাঁচেক এভাবে খেল-বার পরে মাতাদোর তাঁর তলোয়ার বিঁধিয়ে দিলেন ষাঁড়ের বুকে। দর্শকরা তুমুল হর্ষ-ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। ষাঁড়টা হাঁপাতে হাঁপাতে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, পারল না। আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। দর্শকরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

এই জয়ে আমার মন ঠিক সায় দিল না। মনে হল, দারুণ অবিচার করা হয়েছে ষাঁড়টার ওপর।

লড়াই শেষ

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩ ॥

বসুবাড়িতে মা-জননীর কর্তৃত্ব ছিল সর্বব্যাপী। মানুষটি ছিলেন ধবধবে ফর্সা, ছোটখাটো—কিন্তু মনের জোর ছিল অপরিসীম। যুদ্ধের সময় আমরা অনেক রকমের যুদ্ধজাহাজের নাম শুনতাম। আমি মনেমনে মা-জননীকে তুলনা করতাম একটি জার্মান পকেট ব্যাটলশিপের সঙ্গে।

সংসারটি ছিল বিরাট। নিজেরই আট ছেলে ছয় মেয়ে। তাছাড়া মা-জননীর নিজের ভাইদের মধ্যে চার-পাঁচ জন ছিলেন কমবয়সী। তাঁরা দিদির কাছে কটকে থেকে ভাগ্নেদের সঙ্গে পড়াশুনো করতেন। তার উপর মেয়েদের মধ্যে জন দুয়েক কম বয়সে বিধবা হওয়ায় তাঁদের সংসারের ভারও দাদাভাই ও মা-জননীর ওপর পড়েছিল। চাকর-বাকরও অনেক, জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যাও বাড়িতে কম নয়। সব মিলে এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন মা-জননী। আজকাল তো দেখি, দু-চারজনের সংসার নিয়ে অনেক গৃহকর্ত্রীই হিমসিম খান। মা-জননী সর্বদিক নজর রেখে অতি পরিপাটি করে সংসার চালাতেন।

কোনো ব্যাপারে ফাঁকি দিয়ে মা-জননীর কাছে পার পাওয়ার উপায় ছিল না। কটকের বাড়িতে পড়ার ঘরে ছেলেরা ও নিজের ছোট ভাইয়েরা যখন পড়তে বসতেন, তখনও তিনি পাশের ঘর থেকে নজর রাখতেন। তিনি প্রথম প্রথম ইংরেজি বিশেষ কিছুই জানতেন না। ওঁর এক ভাই তার সুযোগ নিয়ে তিনি পাশের ঘরে এলেই একই পাঠ বারবার জোর গলায় পড়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, পড়াশুনো খুব চলছে। কিন্তু মা-জননী ধরে ফেলতেন। পরে ডেকে তাঁকে বললেন যে, ইংরেজি না জানলেও মন দিয়ে শুনে তিনি বুঝেছেন যে, একই পাঠ বারবার পড়ে তিনি তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছেন। পরে অবশ্য এক মেমসাহেব রেখে মা-জননী খানিকটা ইংরেজি শিখেছিলেন।

হাতের লেখা ছিল তাঁর মুক্তোর মতো। আমাদের মায়েরা আমাদের হাতের লেখা অভ্যাস করাবার সময় মা-জননীর হাতের লেখা দেখে লিখতে বলতেন। সব ব্যাপারে নিখুঁত হবার চেষ্টায় কিন্তু একটা বড়ই অসুবিধার সৃষ্টি করতেন তিনি। সব কাজেই তাঁর সময় একটু বেশি লাগত। স্নান, খাওয়া, নিজের হাতে খাবার তৈরি করা, ট্রেন ধরবার সময়, সব ব্যাপারে তিনি এতই দেরি করতেন যে, বাড়ির সকলেই ছটফট করতেন। কলকাতা যাওয়া হবে। শুনেছি কটক স্টেশনের দিকে পুলের উপর রেলগাড়ির শব্দ পেলে তবেই তিনি ধীরেসুস্থে বাড়ি থেকে যাত্রা করতেন।

একটা ব্যাপারে মা-জননীর বিশেষ দুর্বলতার কথা আমাদের বাড়িতে এখনও অনেকেই বলেন। সেটা হল গায়ের রঙ। অনেকেরই ধারণা, ফর্সা রঙের প্রতি তাঁর একটা অস্বাভাবিক টান ছিল। ছেলেদের বৌ পছন্দ করার ব্যাপারে মা-জননীর কথাই ছিল শেষ কথা এবং রঙ ময়লা হলে তাঁর হাতে পাস করা খুবই কঠিন ছিল। তিনি ভাবী কুটুম্বদের বাড়ির সামনে জুড়িগাড়িতে বসে থাকতেন। যাঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়নি, তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করতে তাঁর সংস্কারে বাধত!

মেয়েকে গাড়ির ভিতরে আনিয়ে তিনি পরীক্ষা নিতেন। তার মধ্যে একটা ছিল ক্রীম পাউডারের প্রলেপ অতি উত্তমরূপে মুছে নিয়ে ভাল করে দেখা যে, মেয়ের গায়ের রঙ আসলে কী রকম! নাতি-নাতনিদের বেলায়ও

৺পুরী স্বর্গদ্বার ধাম
৮ তাং আষাঢ়
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুপদ
ভরসা

Censored and passed,
11/8/26.
D. I. G.
I. B., C. I. D.,
Bengal.

কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুভাষ চন্দ্র
দীর্ঘজীবেষু

বাবা বহু দিবস পূর্ব্বে আমি তোমার এক খানি পত্র পাইয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তাহার উত্তর দিয়াছি।

তোমার খবর আমি মধ্যে ২ বৌমাদের নিকট হইতে পাইয়া থাকি।

তেঁর শরীর এখন অনেকটা ভাল আছে, পুরীর জগন্নাথ সম্প্রদায় লইয়া তিনি কলিকাতায় যাইবেন সেই জন্য আজ [illegible] যাত্রা করিবে।

আমি এখন ৺পুরীতেই আছি

প্রমীলা ও তাহার ছেলেরা এবং সুরেশ ও মা মনি ও ছেলেরা সাথে আছে।

মা-জননীর হাতের লেখা

টেনিদার বাড়ি পটলডাঙায়,
প্যালাকে সে বড় চক্ষু রাঙায়।
তা হোক, টেনিই দলের লীডার
গ্রীষ্মে ও শীতে রোজ চাই তার
জিভে জল-আনা সুগন্ধী খাসা
বাদাম পেস্তা পুষ্টিতে ঠাসা
কোয়ালিটি কোম্পানির হিম
ঠাণ্ডা মিষ্টি আইসক্রীম।
মুখে দিলে গলে যায়,
আহারে কি পুষ্টি!
Kwality
আইসক্রীম
KIC 3795

এই নীতি একটা চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি করত। আমাদের মধ্যে অনেকের মনে হত মা-জননী হয়তো গায়ের রঙের জন্য পক্ষপাতিত্ব করেন। কেবল গায়ের রঙ কেন, রান্নার রঙ নিয়েও তিনি টিপ্পনী কাটতেন। ঝোলের রঙ যদি কালো হত, বামুন ঠাকুরকে তিনি বলতেন, "কী, নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে রান্না করেছ নাকি?"

মা-জননী ছিলেন অনেক দিক দিয়ে খুবই উদার, আবার অন্য ব্যাপারে সেকালকার নানা সংস্কারের সাক্ষী। তোমরা হয়তো শুনে অবাক হবে যে, তাঁদের সময় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বেড়াতে বেরনো ছিল একটা অভিনব ব্যাপার। লোকে নানা কথা বলত, বলত এ আবার কেমন সাহেবিয়ানা। মা-জননী কিন্তু দাদাভাইয়ের সঙ্গে জুড়ি-গাড়ি চেপে খোলাখুলিভাবে কটকে সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন। অন্য দিকে আবার মুরগি ও ম্লেচ্ছ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তিনি এমন সব মতামত দিতেন, যা আমাদের কানে বাজত। আমার বাবা ছিলেন বেশ ভোজনবিলাসী, আর মা ছিলেন চিররুগ্ণা। সেজন্য আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে দেশী-বিদেশী নানা রকমের রান্না হত। দাদাভাই ও মা-জননী উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকলে আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা করতে হত। এলগিন রোডের বাড়িতে তো আমিষ ও নিরামিষ রান্নার আলাদা ব্যবস্থা সব সময়েই দেখেছি। ডাক্তারের পরামর্শে আমার মাকে নিয়মিত মুরগি খেতে দেওয়া হত। মা-জননী বলতেন, স্বাস্থ্যের জন্য মুরগি খেতে তাঁরও আপত্তি নেই, তিনিও নাকি কখনও কখনও ডাক্তারি মতে অসুখে-বিসুখে মুরগির সুপ খেয়েছেন। কিন্তু মুরগি খাওয়া শেষ হলেই তিনি নাকি কাপড়-চোপড় বদলে ফেলতেন! আমরা বিস্ময়ে ভাবতাম, পেটে তো মুরগি রইলই, কাপড়টা বদলে লাভ কী!

তাঁর হাতের সব কাজই ছিল নিখুঁত। হাতের লেখার কথা তো আগেই বলেছি। সেলাইয়ের কাজও তাই। যাকে ইংরেজিতে বলে পারফেকশনিস্ট। তাঁর হাতের তৈরি চন্দ্রপুলি খাবার জন্য আমরা লাইন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম বলা চলে। কেনাকাটার

মা-জননী প্রভাবতী

ব্যাপারে তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। এলগিন রোডের বাড়িতে মা-জননীর আম কেনা ছিল দেখবার মতো ব্যাপার। সেকালে আমওয়ালারা কিলো হিসাবে নয়, শ'য়ে শ'য়ে বিক্রি করত বাড়িতে এসে। দরাদরিতে আমওয়ালারা মা-জননীর কাছে তো হার মানতই, একশো আম বিক্রি করেও একটাও নিকৃষ্ট বা পচা বা কাঁচা ফল চালাতে পারত না।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে আজকের মতো শেষ করি। ছেলেবেলা থেকে রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র তো তাঁর মা-বাবার অনেক চিন্তার কারণ হয়েছেন, তাঁর অনেক পাগলামি তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। ১৯২১ সাল। ছেলে তো ঠিক করে বসে আছেন যে, আই সি এস ছেড়ে দেবেন। দেশের কাজে ঝাঁপ দেবেন। বাবা জানকীনাথ বোঝাবার চেষ্টা করছেন, দেশে ফিরে ভেবেচিন্তে ঠিক করলেই তো হয়। মা প্রভাবতী মন্তব্য করলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগের মন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তোমরা বোধ করি জানো, মহাত্মা গান্ধী তখন সবেমাত্র দেশকে অসহযোগের পথে ডাক দিয়েছেন। (ক্রমশ)

সতুদের রহস্যভেদ

আশিস বর্মণ

মফস্বলে বেড়াতে এসে আচমকা গোরাদাকে দেখে সতু পুলকিত হয়। তার একটু একা-একা লাগছিল ক'দিন। এমনিতে খোলামেলা বাতাস, লাল জমির মাঠ, বাড়ির অদূরে পলাশের টকটকে দীপ্তি। তাকে ভিতরে ভিতরে খুশিতে হালকা করে দিয়েছিল। প্রথমদিন সকালে, মা-বাবা যখন বাড়ির ভিতর ব্যস্ত ছিলেন, তখন সে একা বাইরে এসে হঠাৎ এমন চনমনে বোধ করল যে, হাত দুটো শূন্যে তুলে এক লম্বা ছুট দিয়েছিল মাঠে।

কিন্তু দুপুরে, মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়লে পর, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যখন গাছের পাতা উড়িয়ে হাওয়া বয়, দূরে কোথা থেকে একটানা কুক-কুক-কুক আওয়াজে ডাহুক ডাকে, এবং মাঝে মাঝে ঘুঘু, তখন সতুর মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। সে আস্তে বিছানা থেকে উঠে, পা টিপে টিপে সন্তর্পণে ভিতরের বারান্দায় এসে বসে। আর আচমকা বন্ধুদের জন্যে মন কেমন করে ওঠে।

তাই সে-দিন হাটে গিয়ে অকস্মাৎ গোরাদাকে দেখে সতুর বুকের ভিতর ধক্ করে ওঠে। ভয়ে নয়, আনন্দে। তার মুখ দিয়ে বিস্ময়ে বেরিয়ে যায়, "আরে তুমি, গোরাদা!"

"তুই কোত্থেকে?"

"বাঃ, আমরা তো বেড়াতে এসেছি।"

"কবে?"

"সোমবার, তুমি?"

"আমরা কাল পৌঁছেছি।" গোরাদা হাসে, বলে, "এখানে আমরা প্রায়ই আসি।"

"তাই বুঝি!"

সতু মহা খুশি, বলে, "খুব ভাল হল, মজা!"

গোরাদা কিছু বলার আগে বাবা এসে হাজির। হাসি মুখে বললেন, "এই তো, বন্ধু পেয়ে গেছ তুমি।"

গোরাদা ক্লাস এইটে পড়ে। সতু বলে, "ওর সঙ্গেই আমি বাড়ি ফিরি।"

"ওঃ হো!" বাবা হাসেন, বলেন, "তুমিই গোরা? তোমার কথা সতুর মা খুব বলেন।"

"মাসিমা আমাদের আচার দেন।" গোরাদা বলে, "দারুণ!"

"ফাইন।" বাবা হাসেন, বলেন, "চলো, আমাদের বাড়ি ঘুরে আসবে।"

"একটু পরে।" গোরাদা কেমন বড়দের মতন বলে, "আমি ডিম কিনতে এসেছি।"

"তোমরা কোথায় থাক।" সতু বলে।

"ওই-যে, ওই হলদে বাড়িটা।" গোরাদা আঙুল তুলে দেখায়, তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, "সতু একটু থাকবে, আমি পৌঁছে দেব পরে?"

"কীরে, থাকবি তুই?" বাবা হাসেন।

"হ্যাঁ," সতু তক্ষুনি ঘাড় নাড়ে।

"কিন্তু বেশি দেরি কোরো না তোমরা।" বাবা যেতে যেতে বলেন, "অবশ্য এখানে গাড়িঘোড়ার ভয় নেই।"

"না। শুনশান।" গোরাদা বলে। ওকে চিরকালই সতুর নেতা-নেতা মনে হয়। এখনও তাই লাগে। তার গর্ববোধ হয়। বাবা হাসিমুখে চলে যান। বলে যান আচারের স্টক এখানেও আছে।

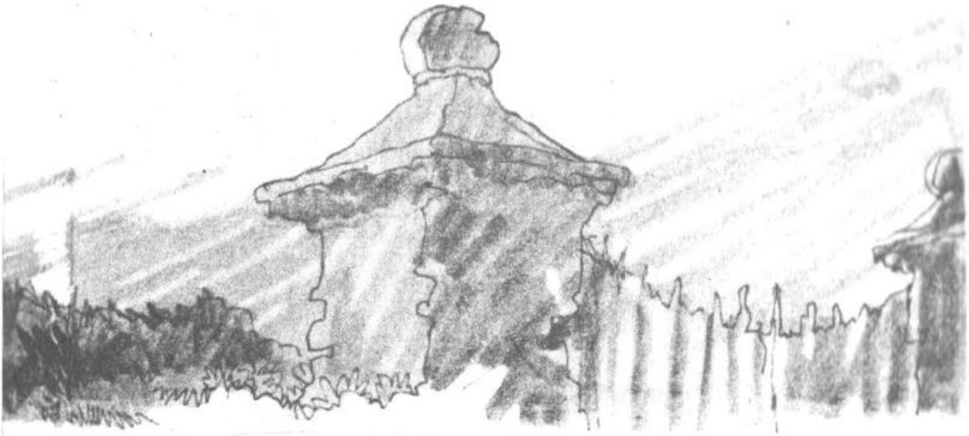

ডিম কিনে গোরাদার বাড়ির দিকে ওরা এগোয়। গোরাদা চলতে চলতে বলে, ''তোর একটু বোর লাগছে না এখানে?''

"বোর?" সতু তাকায়।

''মানে একা-একা, খেলাধুলো নেই... চুপচাপ।''

''আর কি।'' সতু হাসে, বলে, "এবার তো আমরা দুজন।"

"জায়গাটাও ভাল।" গোরাদা বলে, ''এই মাঠটা যেতে যেতে ওদিকে উঁচু টিলা হয়ে গেছে। ওপাশে কি আছে না আছে কিচ্ছু দেখা যায় না। মনে হয় টিলার উপরে উঠলেই চোখে পড়বে ওদিকের রহস্য।''

যা বলেছ! সতু বলে। ওরা দু'জনেই তখন উঁচু টিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। যার আড়াল অজানায় ঢাকা। ওরা থমকে যায়। আর আচমকা একটা হাওয়ার ঘূর্ণি মাঠের কাঁকরে-পাথরে পাক খেয়ে স্তব্ধ প্রান্তরে এক শুঁই-শুঁই আওয়াজ তোলে। মনে হয় কী যেন দ্রুত ছুটে আসছে। আর ঠিক তক্ষুনি, টিলার উঁচু মাথায় ধুলোয়-কাঁকরে-পাতায় মেশামিশি এক লম্বা, গগনমুখী হাত ভেসে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে গোরাদা সতুকে এক টান মারে, চমকে যায় সতু। গোরাদা বলে, "দৌড়ো।"

ওরা দুজনে দৌড়তে থাকে। কয়েক মুহূর্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে দুই বন্ধু। গোরাদাদের বাড়িটা আরও স্পষ্ট হয়ে এলে সে অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ায়, বলে, "এক সেকেন্ড।" সতুও ছোটা বন্ধ করে। তার বুকের ভিতরটা তখনও ধড়াস-ধড়াস করছে। কিছুটা হাঁপে আর কিছুটা উত্তেজনায়। কিংবা উত্তেজনায় ঠিক নয়, আশঙ্কায়। অথচ ঠিক কিসের আশঙ্কা সতু তখনও তা বোঝেনি। সেটা মনের তলায় কোথায় রয়েছে আবছা, অথচ নিশ্চিতভাবে। সতু দেখলো গোরাদা সোজা টিলার চুড়োটার পানে তাকিয়ে আছে। চুড়োটা তখন স্বাভাবিক দেখায়, পাথুরে, গৈরিক ধূসর একাকিত্বে স্থির, দিগন্তে বিস্তৃত। সতু সে-দিকে চেয়ে থেকেই বলে, "কী ব্যাপার, গোরাদা?"

''কিছু না।" গোরাদা এবার হাসে। কিন্তু হাঁপের ভাব তখনও তার যায়নি, বলে, "হঠাৎ কেমন গুলিয়ে গেছিল।"

"হাতটা কিসের?"

"হাত নয়......ঘূর্ণি।"

"ঘূর্ণি?"

"হঠাৎ হাওয়া। ধুলো-পাতার ঝড়। হয় তো পাথরের মরীচিকাও মিশে গেছিল।"

সতু সবটা ঠিক বোঝে না, হয় তো গোরাদাও। কিন্তু সে অস্পষ্ট টের পায় যে আসলে তারা নির্জন স্তব্ধতায়, আচমকা বাতাসের দমকে ও মনের কল্পনায় চমকে উঠেছিল। চমকে গেছিল নিথর টিলার মাথার উপরের অকস্মাৎ ওই ঝাপটানিতে। যা চমকের ঘোরে মনে হয়েছিল অশরীরী প্রাণ, অজানা অপ্রত্যাশিত বিপদ।

"চল্ যাই।" গোরাদা এবার খোলামেলা হাসে, একটু সঙ্কুচিতভাবে, বলে, "আমারই বোকামি।''

1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
যখন হবে দশ তখন হবে সময়
ব্যাঙ্ক অফ বরোদার
কাছে আসার !
হ্যা দশ পেরলেই এস
ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়। আমাদের
মাইনরস সেভিংস এ্যাকাউণ্ট
তোমাকে নিজের এ্যাকাউণ্ট
পরিচালনা করতে দেবে। নিজ পয়সা
জমা করবে আর নিজে তুলবে।
মাইনরস সেভিংস এ্যাকাউণ্ট মাত্র
৫ টাকা দিয়ে যে কোন বয়সেই
খোলা যায়। কিন্তু স্বয়ং টাকা জমা দিতে ও
তুলতে চাইলে কম পক্ষে দশ বছর
বয়স হওয়া প্রয়োজন।
BANK OF BARODA
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
(ভারত সরকারের সংস্থা)
আমরা জানি বড় হওয়া সহজ কথা নয়।
Sobhagya-BOB/80/3

"আমারও।" সতু নিম্নস্বরে বলে।

"আসলে জানিস," গোরাদা বলে, "এখানে কান পেতে থাকলেই মনে হয় রহস্য আছে। এত চুপচাপ চারিদিক।"

"ঠিক।" সতু বলে, "দুপুরে একা-একা পাখির ডাকে কেমন লাগে... না?"

"উদাস।" গোরাদা হঠাৎ বড়দের মতো বলে। তারপর ওরা নীরবে ওদের বাড়িতে পেঁছে যায়। কেন যেন কেউ আর কথা বলতে পারে না। মনে মনে খাপছাড়া, আবছা কী যেন ভাবে। ভিতরে ভিতরে, হৃদয়ের কন্দরে।

গোরাদার মা-বাবা স্টেশনে বেড়াতে গেছেন। ডিমগুলো ঠাকুরকে দিয়ে দুটো আপেল হাতে নিয়ে ওরা বাইরে গাছের গুঁড়িতে এসে বসে। গোরাদা আপেল খেতে খেতে দু' একবার তাকায় সতুর দিকে। সতু টের পায় কিন্তু কিছু বলে না। সে শহরের ছেলে, কলকাতার, গোলমাল গাড়ি-ঘোড়ায় অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের এ অভিজ্ঞতা তার অভিনব, বিস্ময়কর লাগে। সে চিন্তাতেই মগ্ন ছিল। তার মগ্নতা কাটে গোরাদার কথায়। গোরাদা বলে, "আমি একজন অ্যাসিসটান্ট খুঁজছি।"

"অ্যাসিসটান্ট?" সতু গোরাদার মুখের দিকে তাকায়। অল্প অবাক।

"হ্যাঁ।" গোরাদা গম্ভীরভাবে বলে, "ফর মাই অ্যাড্‌ভেনচার... একটা রহস্য ভেদ করতে হবে।"

"আমায় নেবে, তোমার অ্যাসিসটান্ট হিসেবে?"

"তুই পারবি? আর ইউ ব্রেভ?"

"হ্যাঁ। খুব।"

"ভয় পাবি না তো?"

"না।"

"খবর সিক্রেট রাখতে পারিস তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"গুড!" গোরাদা বলে, "তাহলে আজ বিকেলে আমরা অ্যাডভেঞ্চারে যাব। ও, কে.?"

"ও, কে.।" সতু তখন ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত বোধ করে, অথচ গলা নামিয়ে বলে, "কিন্তু, কোথায় কী আবিষ্কার, গোরাদা?"

"পোড়ো বাড়ি।" গোরাদা গম্ভীরভাবে বলে, "এখান থেকে কিছু দূরে একটা পোড়ো বাড়ি আছে। নিরিবিলি ফাঁকা। কেউ থাকে না, কিন্তু ভীষণ রহস্যময়। হাতছানি দেয়।"

"সত্যি?"

"দেখবি।" গোরাদা বলে, "আজ বিকেলে আমরা দু' জনে আলাদা বেড়ানোর নামে ওদিকে যাব। রাজি?"

"রাজি। কিন্তু মা-বাবা ছাড়বেন?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ।" গোরাদা হাসে, বলে, "এখানে অ্যাকসিডেন্টের ভয় নেই। খেলতে খেলতে আমরা হাওয়া হয়ে যাব।"

সতুও হাসে। খুব মজা পায়। কিন্তু তার গা শিরশির করে ওঠে। বুকের মধ্যে একটু দুরদুর করে।

"চল্ তোকে পেঁছে দিই।" গোরাদা উঠে বলে, "নইলে বিকেলে হয়তো ছাড়বে না।"

"চলো।"

সারা দুপুর কাটে সতুর উত্তেজনায়। শুধু উত্তেজনায় নয়, বরং চাপা উদ্বেগে।

দুপুরে এমনিতেই ঘুম তার হয় না। প্রথমটা খেয়েদেয়ে চোখ জড়িয়ে এলেও অচিরে তন্দ্রা কাটে। অথবা সামান্য ঘুমের পর সে জেগে উঠে চুপচাপ শুয়ে থাকে বহুক্ষণ। আজ সে তন্দ্রার ঘোর তো এলোই না, উপরন্তু সে অসাড় হয়ে শুয়ে থাকতেও পারল না তেমন। কেবলই উসখুস করতে থাকল। মনের অস্থিরতা তাকে অবিরত চঞ্চল করে। মা এক সময় আধোঘুমের মধ্যে বলেন, "অমন করছিস কেন, তুই?"

"ঘুম আসছে না।"

"মাঠে ঘুরে আয়। আস্তে, বাবাকে তুলিস নে।"

সতু বেঁচে যায়। সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। একা একা কাটায় মনের চাপা উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে।

বিকেল হতেই আসে গোরাদা। এসে খবর দেয় ওর বাবা-মা আসছেন বেড়াতে। মা শুনে হাসেন, বলেন, "ভালই হ'ল, আমরাই যাব ভাবছিলুম। তোরা দিগ্‌রিয়ায় বেড়াতে গেছিস কখনও?"

"হ্যাঁ।" গোরাদা বলে, "আপনারা যান না আজ... খুব সুন্দর জায়গা। বাবা রাস্তা চেনেন।"

"তোরা দু' জন কী করবি?"

"আমরা কুঁকড়াঝোরায় যাব। বালি

নিয়ে খেলব।"

"জল নেই তো?"

"না-না। পাথর আর বালি। বর্ষায় জল হয়।"

"দেরি করো না কিন্তু।"

"উঁহু।"

ওরা খুব অল্পেই রেহাই পেল। তবু ওদের অভিযানে খানিকটা দেরি হয়ে যায়। মা দু'জনকেই না খাইয়ে ছাড়লেন না।

মাঠ পেরিয়ে পোড়ো বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে সতুর চাপা চাঞ্চল্য আবার বাড়তে থাকে। সে বলে, "বাড়িটা কদ্দূর গোরাদা?"

"ওই যে, সামনের জঙ্গলটা দেখছিস।" গোরাদা বলে, "ওটা পেরিয়ে।"

"ওটা কীসের জঙ্গল?"

"কেঁদু, পলাশ আর শাল গাছের। ঝোপঝাড়ও আছে।"

"বাঘ?"

"দূর! বাঘ-ভাল্লুক এখানে থাকে না। খরগোশ আছে, শেয়াল আছে।"

"ওটার ভিতর দিয়ে যেতে হবে না-কি?"

"গেলে শর্টকাট হয়, যাবি?"

"অন্য রাস্তা নেই?" সতুর গলা কেমন ক্ষীণ শোনায়।

"আছে।" গোরাদা হাসে, বলে, "চল ঘুরেই যাব। তুই বড্ড ভিতু!"

"না-না।" সতুর লজ্জা হয়, মর্যাদাবোধে হঠাৎ লাগে, সে বলে, "কী দরকার, শর্টকাটেই চলো।"

"থাক। বেশি ঘুরতে হয় না।" গোরাদা ও'র কাঁধ চাপড়ায়, বলে, "মিনিট পনেরোয় কী এসে যায়।" কিন্তু ওদের পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে আসে। হঠাৎ, ঝুপ করে যেন সূর্য মেলায়। এবং চারিদিক ঘিরে আসে ছায়া-ছায়া, ধোঁয়া-কালির মতো আবছা আঁধার। সেই প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্ট অন্ধকারে অদূরে, জংলা বাগানের মধ্যে, ভাঙা-শ্যাওলা-ধরা বাড়িটাকে ভাল নজরে পড়ে না। লতা-পাতা গাছের মধ্যে দিয়ে শুধু তার একটা ঝুপসি ইঙ্গিত মেলে। সে-ইঙ্গিতে জড়ানো অজানা রহস্য ও অনুক্ত শঙ্কা। সতুর বুকটা কেঁপে ওঠে। গলার ভিতরটা লাগে শুকনো-শুকনো। বাগানের ভাঙা গেটটা ঠেলার আগে গোরাদা তার দিকে তাকায়, বলে, "কী রে, ভয় করছে?" সতু নীরবে মাথা নাড়ে, আস্তে বলে, "কৈ, না তো।"

"ভিতরে যাবি?"

"তুমি যাবে?"

"বাঃ! এতদূর এসে ফিরে যাব।"

"টর্চ এনেছ?"

"না।"

"অন্ধকার হয়ে এসেছে কিন্তু।"

"পকেটে দেশলাই আছে।" গোরাদা বলে। তার মুখ উত্তেজনায়-শঙ্কায় দপদপ করে, সে চাপা রুদ্ধ গলায় বলে, "তুই বরং বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, আমি দেখি গে।"

"না।" সতু খপ করে ওর হাত চেপে ধরে, কাঁপা গলায় বলে, "আমিও যাব সঙ্গে।"

"তবে চ...দেরি করিস না আর।"

ওরা আরও কয়েক পা এগিয়ে যায়। গোরা ভাঙা গেটটা ঠেলতেই একটা উৎকট কিঁ-ই-ই-চ্ আওয়াজ হয়। শব্দটা অন্ধকার চিরে দেয়। আর সতু দু'হাত দিয়ে গোরাদার বাহু চেপে ধরে। দুজনেই থমকে যায়। গোরাদা হঠাৎ গাঢ় গলায় বলে, "উঃ, ভয় পেয়ে গেছিলুম!"

"আমিও।"

"আসলে কিছু না।" গোরাদা হাসে ম্লান, বলে, "গেটটা গেছে...কতকাল খোলা হয় না। আয়।"

ওরা গেট দিয়ে এবার ভিতরে ঢোকে। তখনও বাইরে আবছা আলো, কিন্তু সামনের ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে বাড়িটাকে কালো আঁধারের পুঞ্জের মতো লাগে।

ভাঙা বারান্দায় ওঠে দু'জনে, ভাঙা সিঁড়ির একটা ইঁট পা রাখতে গিয়ে খসে যায়। গোরাদা ঝট করে সতুকে ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর দু পা বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যায় ওরা, গোরাদা চুপ করে থাকার ইশারায় ঠোঁটে আঙুল চেপে রাখে। বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে কান ঠেসে শোনে ভিতরে কোন সাড়া আছে কিনা। ইঙ্গিতে সতুকেও বলে শুনতে। সতুও কান লাগায়, কিন্তু ভিতরে কোনো শব্দ শুনতে পায় না। শুধু টের পায় নিজের বুকের তোলপাড়, ধড়ফড়ানি। গোরাদা ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, "কী-রে, কিছু শুনেছিস?"

সতু মাথা নেড়ে 'না' বলে। গোরাদা এবার ধীরে দরজাটা ঠেলে, হাওয়া ওঠে তখুনি, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লাটা খুলে যায় ক্যাঁচ শব্দে। ভিতরে ঘোর অন্ধকার, কিন্তু চকিতে মনে হয় অশরীরী কী যেন সরে যায়। ওদের বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। তবু গোরাদা চাপা স্বরে বলে, "আয়।"

সে ভিতরে যায়, পিছনে ঢোকে সতু। চোখে কিছু পড়ে না, মিশমিশে অন্ধকার কেবল। ওরা এক মুহূর্ত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে, আঁধারে দৃষ্টি সওয়ায়। ঠিক তখনই দড়াম করে অন্য পাল্লাটাও খুলে যায়। ওরা চমকে ওঠে। মনে হয় পাশ দিয়ে কে মিলিয়ে গেল। হাওয়ার মতো ঈষৎ ঠান্ডা। গোরাদা খপ করে সতুর হাতটা চেপে ধরল, কাঁপা গলায় বলল, "ভয় নেই তোর। আমি আছি।"

"কিন্তু পাশ দিয়ে কী যেন ছুটে গেল।"

"দমকা বাতাস। চল এগোই।"

কিন্তু ওরা কয়েক পা আন্দাজে এগোতেই শূন্যে একটা ধড়ফড় আওয়াজ হল। ওদের গায়ে-মাথায় কী সব ঝরে পড়ল। সতু ঝাপটে ধরল গোরাদাকে। তার মুখ তখন ফ্যাকাশে। ঠোঁট সম্পূর্ণ শুকনো। গলায় কোনো স্বর নেই। গোরাদাও কেমন কাঠ হয়ে যায় এক মুহূর্ত। কোনো বাক্য ফোটে না তার মুখে। শেষে চেরা, ভাঙা গলায় বলে, "বাদুড় বোধহয়।" সতু আর পারে না, বুকের তোলপাড়ের মধ্যে সে ফিসফিসিয়ে বলে, "গোরাদা, বাড়ি যাব।"

"যাবি? তাই চল।"

কিন্তু তারা এক পা নড়ার আগেই নিথর হয়ে যায়। মাটিতে আঁটা দুই মূর্তির মতো অসাড়। একই সঙ্গে তাদের চোখে পড়ে ঘর পেরিয়ে ভিতরের বারান্দায় একটা ক্ষীণ আলো। আলোটা অন্ধকার শূন্যে এগোয়, এদিকেই এগিয়ে আসে বোধহয়। আর সেই আলোর সামনে টাঙানো চটের পর্দায় হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে এক উদ্ভট, কুঁজো প্রেতাত্মার প্রলম্বিত ছায়ামূর্তি।

"চল, পালা!...ভূত!" এক টানে সতুকে নিয়ে গোরাদা বাইরের দিকে দৌড়য়। দরজা পেরিয়ে যায় ওরা চকিতে, তীরের মতো। কিন্তু বারান্দায় এসে গোরাদা পড়ে যায় দড়াম করে। আর পিছনে, অনেকটা দূরে কে যেন নাকি সুরে ডাকে "কে-রে, কে—"

কোনোক্রমে সতুর হাতে ভর দিয়ে গোরাদা উঠে দাঁড়ায়। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে-ও গোরাদা চেঁচিয়ে ওঠে, "দৌড়ো সতু, দৌড়ো।" নিজেও ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

পরের দিন সকালে ওদের লজ্জার শেষ থাকে না। হাঁটুতে ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা গোরাদা সতুকে নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে বলে, "সব বরবাদ হয়ে গেল!"

"কেন?"

"দূর! ওটা নাকি কুন্তি বুড়ির আস্তানা। বুড়ির আশি বছর বয়স, ওই পোড়োবাড়িতে থাকে। ওর সঙ্গী বাদুড়, ইঁদুর, নোংরা।"

"যাঃ!"

"বাবা খুব ঠাট্টা করলেন।" গোরাদা মন-মরা গলায় বলে, "প্রেস্টিজ ছিল আমাদের!"

ছেলেটির নাম লালবাহাদুর শ্রীবাস্তব। একে তো ভীষণ গরিব, তার উপর দেড় বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। মায়ের সঙ্গে গিয়ে ছেলেটি উঠল এক আত্মীয়ের বাড়ি। একটু বড় হতে অনেককে ধরাধরি করে মা তাকে ভর্তি করে দিলেন, নদীর ওপারের একটা স্কুলে। খেয়ায় নদী পার হতে লাগে এক পয়সা। মা যেদিন দুটো পয়সা দিতে পারেন, খেয়ায় চড়ে, নয়তো সাঁতরেই পারাপার। গায়ের জামা খুলে বইখাতা একটা পুঁটলি করে মাথায় বেঁধে সাঁতরে যাও, ওপারে গিয়ে জামাটা কোমরে জড়িয়ে, ধুতিটা রোদে হাওয়ায় শুকিয়ে নাও, তারপর ফিটফাট হয়ে স্কুলে ঢোকো। বই নেই তো অন্যদের বই ধার করে পড়ো। বড় হয়ে সেই ছেলে 'শাস্ত্রী' উপাধি পেয়ে গেলেন। আরও বড় হয়ে তিনিই একদিন হন এ-দেশের প্রধানমন্ত্রী।

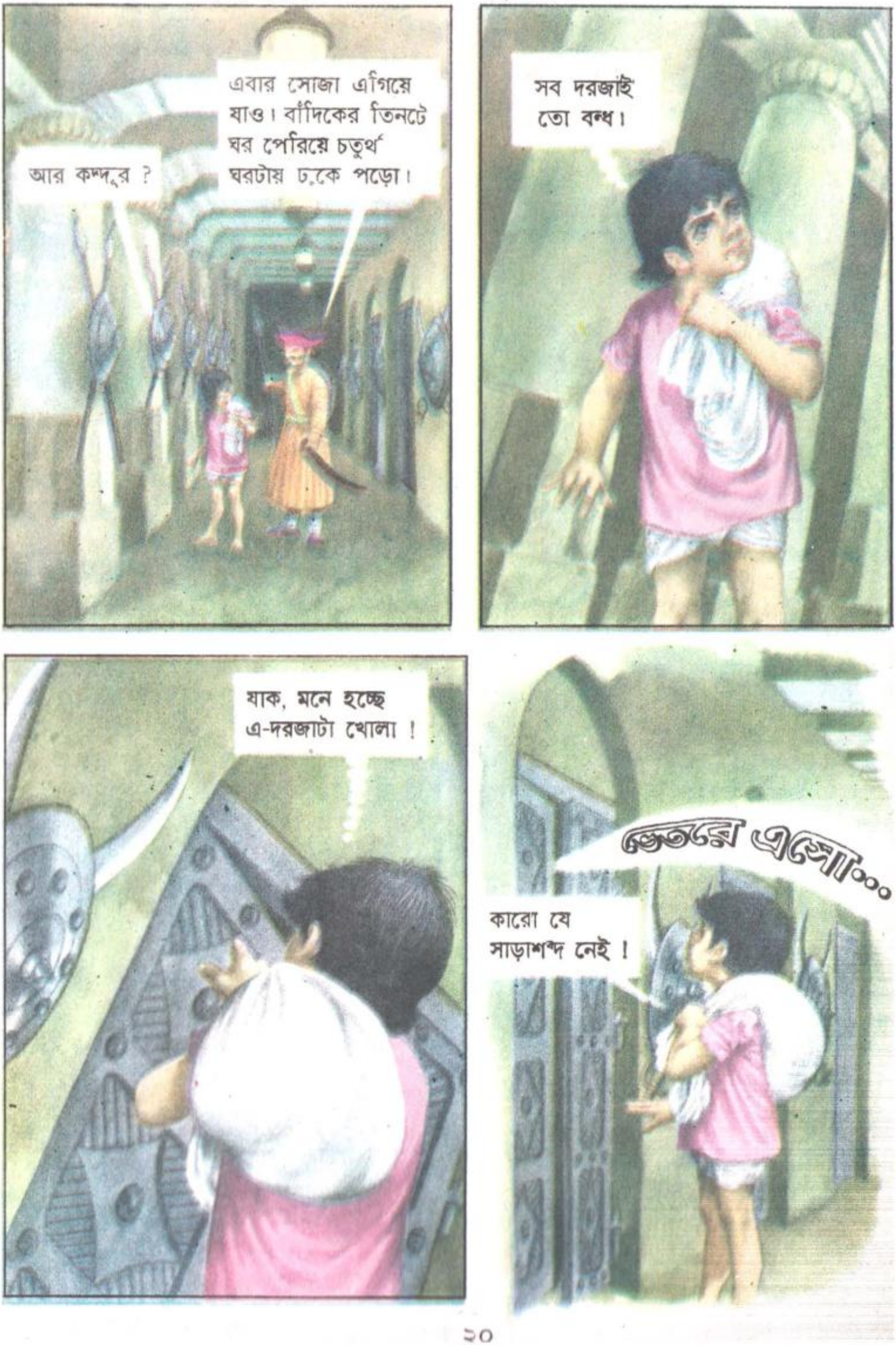
আর কদ্দূর ?
এবার সোজা এগিয়ে যাও। বাঁদিকের তিনটে ঘর পেরিয়ে চতুর্থ ঘরটায় ঢুকে পড়ো।
সব দরজাই তো বন্ধ।
যাক, মনে হচ্ছে এ-দরজাটা খোলা !
ভেতরে এসো...
কারো যে সাড়াশব্দ নেই !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

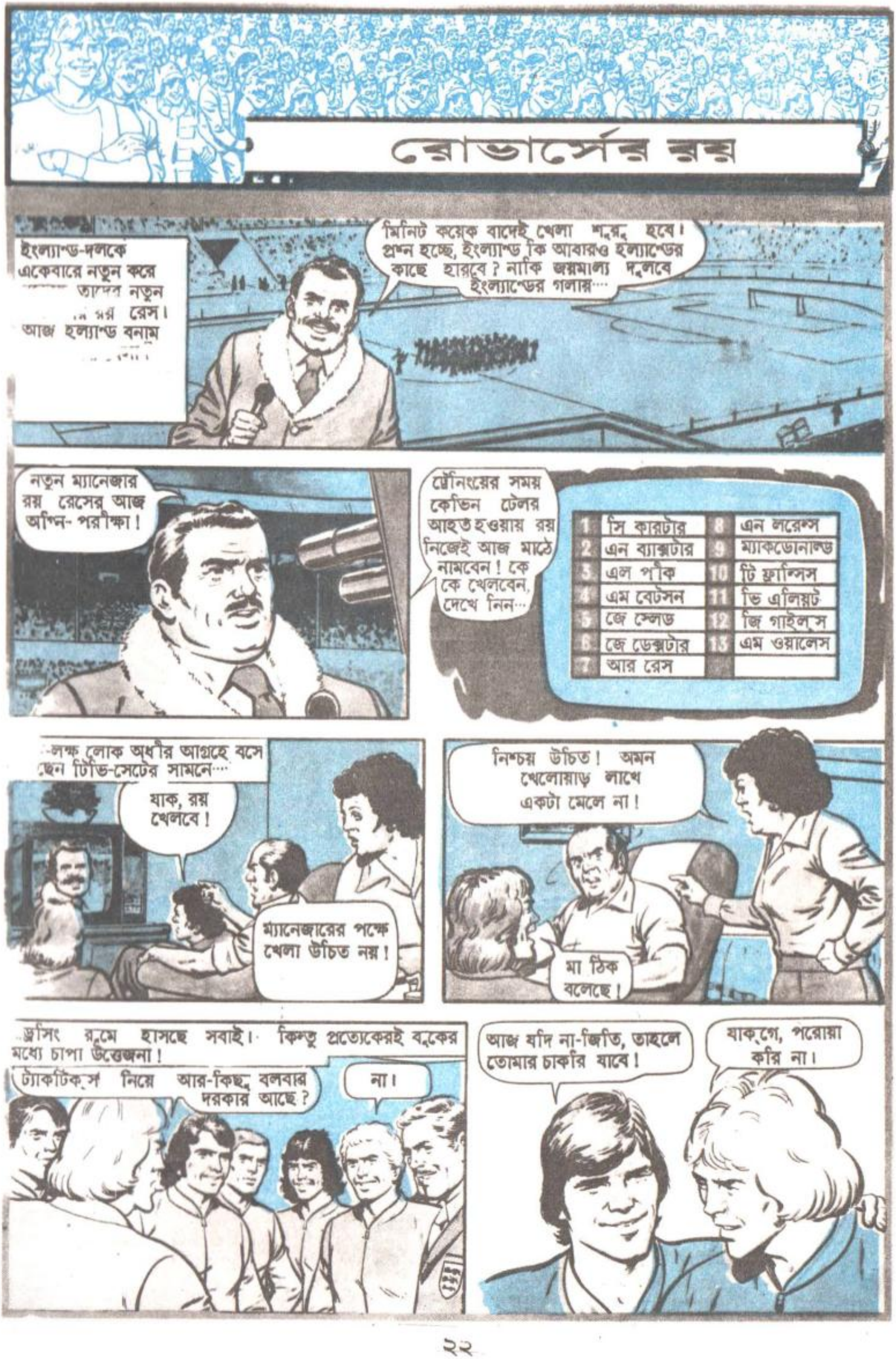
রোভার্সের রয়
ইংল্যান্ড-দলকে একেবারে নতুন করে
তাদের নতুন
রেস।
আজ হল্যান্ড বনাম
মিনিট কয়েক বাদেই খেলা শুরু হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইংল্যান্ড কি আবারও হল্যান্ডের কাছে হারবে? নাকি জয়মাল্য দুলবে ইংল্যান্ডের গলায়…
নতুন ম্যানেজার রয় রেসের আজ অগ্নি-পরীক্ষা!
ট্রেনিংয়ের সময় কেভিন টেলর আহত হওয়ায় রয় নিজেই আজ মাঠে নামবেন! কে কে খেলবেন, দেখে নিন…
1 সি কারটার
2 এন ব্যাক্সটার
3 এল পীক
4 এম বেটসন
5 জে স্লেড
6 জে ডেক্সটার
7 আর রেস
8 এন লরেন্স
9 ম্যাকডোনাল্ড
10 টি ফ্রান্সিস
11 ভি এলিয়ট
12 জি গাইল্‌স
13 এম ওয়ালেস
লক্ষ লোক অধীর আগ্রহে বসে আছেন টিভি-সেটের সামনে…
যাক, রয় খেলবে!
ম্যানেজারের পক্ষে খেলা উচিত নয়!
নিশ্চয় উচিত! অমন খেলোয়াড় লাখে একটা মেলে না!
মা ঠিক বলেছে!
ড্রেসিং রুমে হাসছে সবাই। কিন্তু প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে চাপা উত্তেজনা!
ট্যাকটিক্‌স নিয়ে আর-কিছু বলবার দরকার আছে?
না।
আজ যদি না-জিতি, তাহলে তোমার চাকরি যাবে!
যাক্‌গে, পরোয়া করি না।

ইংল্যান্ড-দল মাঠ প্রদক্ষিণ করছে···
এ-দলে মেলচেস্টারের খেলোয়াড়ই বেশি
রয়! রয়!
আলোচনা চলছে···
একটা দল থেকে এত খেলোয়াড় নেওয়া উচিত হয়নি!
একটু বাদেই বোঝা যাবে!
হল্যান্ডের অধিনায়কের করমর্দন করছে রয়····
রয়, তুমি আজ না-জিতলে মুশকিলে পড়বে
না-জেতবার কথাই ওঠে না যোহান!
শুরু···
হল্যান্ড এগোচ্ছে!
গোড়াতেই গোল দিয়ে আমাদের মনোবল ভাঙতে চায়!
কিন্তু না, ইংল্যান্ড রুখে দিয়েছে!
যাক্ বাবা!
হঠাৎ···
উঃ!
শাব্বাশ ডেক্সটার! জোর রুখেছ!
ডেক্সটার বল দিয়েছে লরেন্সকে····
লরেন্স দিয়েছে ফ্রান্সিসকে····
ফ্রান্সিস দুজনকে কাটিয়ে রয় রেসকে বল দিল····
ম্যাকডোনাল্ডও এগিয়ে গেছে এবারে দেখা যাক কী হয়····
এর পরে আগামী সংখ্যায়

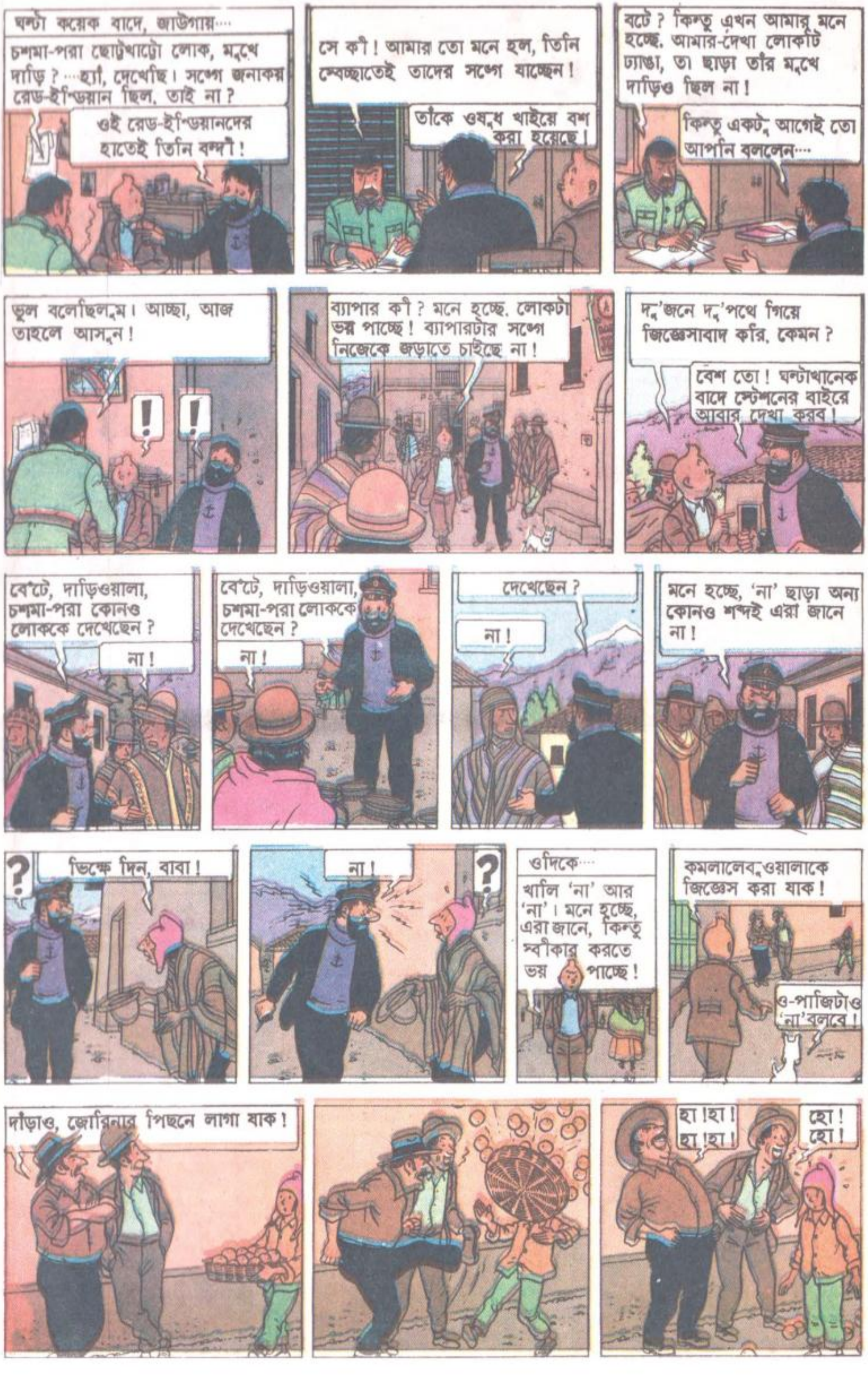
ঘন্টা কয়েক বাদে, জাউগায়···
চশমা-পরা ছোটখাটো লোক, মুখে দাড়ি ? ···হ্যাঁ, দেখেছি। সঙ্গে জনাকয় রেড-ইন্ডিয়ান ছিল, তাই না ?
ওই রেড-ইন্ডিয়ানদের হাতেই তিনি বন্দী !
সে কী ! আমার তো মনে হল, তিনি স্বেচ্ছাতেই তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন !
তাঁকে ওষুধ খাইয়ে বশ করা হয়েছে !
বটে ? কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার-দেখা লোকটি ঢ্যাঙা, তা ছাড়া তাঁর মুখে দাড়িও ছিল না !
কিন্তু একটু আগেই তো আপনি বললেন···
ভুল বলেছিলুম। আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন !
!
!
ব্যাপার কী ? মনে হচ্ছে, লোকটা ভয় পাচ্ছে ! ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছে না !
দু'জনে দু'পথে গিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করি, কেমন ?
বেশ তো ! ঘন্টাখানেক বাদে স্টেশনের বাইরে আবার দেখা করব !
বে'টে, দাড়িওয়ালা, চশমা-পরা কোনও লোককে দেখেছেন ?
না !
বে'টে, দাড়িওয়ালা, চশমা-পরা লোককে দেখেছেন ?
না !
দেখেছেন ?
না !
মনে হচ্ছে, 'না' ছাড়া অন্য কোনও শব্দই এরা জানে না !
?
ভিক্ষে দিন, বাবা !
না !
?
ওদিকে···
খালি 'না' আর 'না'। মনে হচ্ছে, এরা জানে, কিন্তু স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছে !
কমলালেবুওয়ালাকে জিজ্ঞেস করা যাক !
ও-পাজিটাও 'না' বলবে !
দাঁড়াও, জোরিনার পিছনে লাগা যাক !
হা ! হা ! হা ! হা !
হো ! হো !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

২১ লাখ নতুন লোক গত বছরে ডেট কেক ব্যবহার আপন করে নিয়েছেন

এর এক খাস কারণ – ডেটের দারুণ ধোয়া

আজ, আগের থেকেও বেশী লোক ডেট কেকের দারুণ ধোয়া পছন্দ করছেন; ওঁরা বলেন, এটি যেমন চোখ ধাঁধানো সাদা করে, তেমনি অনেক বেশী সাশ্রয়ও পড়ে।

[illegible]	
	নতুন গ্রাহক
ডেট কেক	২১,০০,০০০
এর পরের উৎকৃষ্ট কেক	১৪,০০,০০০
মোট ৪৯,০০,০০০ নতুন গ্রাহক	
উৎস: রিটেল স্টোরের অডিট রিপোর্ট: জানুয়ারী—ডিসেম্বর, ১৯৭৯. ব্যবহারের ভিত্তি: ১টি কেক, প্রতি মাসে, প্রতি ব্যক্তি	

২১,০০,০০০ নতুন লোক তো ডেট কেক ব্যবহার করছেন।
কি, আপনিও তো?

ডেট কেক

ব্যবহার করুন
সাদাকে আপন করুন

Shilpi-DM-14A/80 Ben

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতিকে চুরি করেছেন চন্দ্রভানু। কিন্তু ট্রেন-যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিসের হাতে আটক বেহুঁশ একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেন জয়রাম। স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পায়। পরে সেখানকার ধনী বাসিন্দা সূর্যনারায়ণের কাছে। তার নাম এখন দেবদত্ত, ওরফে দেবু। সূর্যনারায়ণ জয়রামের বন্ধু; কিন্তু দেবু যে জয়রামের ছেলে, সূর্য তা জানেন না। ওদিকে নকল-জ্যোতিকেও চন্দ্রভানু চুরি করেছেন। গাড়ি চালাতে গিয়ে সে দুর্ঘটনা ঘটায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হবে। শোকার্ত জয়রাম সূর্যনারায়ণের বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু দেবু ইতিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘর ছেড়েছে। দেবু ও সন্ন্যাসী এখন ফুল-ডাঙায়। সান্ন্যাসীর কৃপায় বিস্তর লোকের অসুখ সেখানে সেরেছে। তারপর—

॥ ২২ ॥

খানিক পরেই বটগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল গাড়িটা।

গাড়ির ভেতরে জ্যোতি তখনও শুয়ে আছে। গাড়ি থামতেই সে জিজ্ঞেস করলে, "এ আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে এলে বাবা?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন "এখানে এনেছি তোমার পা ভাল করে দেবার জন্যে! তোমার নিজের দোষের জন্যেই তো এই রকম হল। তুমি যদি নিজে গাড়ি চালাতে চেষ্টা না করতে, তাহলে আর এমন দুর্ভোগ হত না।"

জ্যোতি তখন একটু ভাল হয়েছে, কিন্তু তাকে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটিতে হয়। হাতে একটা লাঠি নিতে হয় সব সময়ে। ডাক্তাররা বলেছিল, যদি পা কেটে ফেলা না হয়, তাহলে পরে পা'টা পচে যাবে। তখন আধ-খানা পা কেটে ফেলতেই হবে। কারণ সব সময়ে যন্ত্রণা হয় পায়ে।

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তুমি একটু গাড়ির ভেতরে অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুনি আসছি। দেখি যদি সাধুবাবার দেখা পাই।"

বলে তিনি গাড়ির দরজা খুলে বাইরে গেলেন।

বটগাছটার তলায় তখন অনেক লোকের ভিড়। চন্দ্রভানুবাবু বুঝতে পারলেন ওরা সবাই সাধুবাবার কাছে এসেছে রোগী দেখাতে। মন্দিরটার সামনে একটা চাতাল। সিমেন্ট বাঁধানো। জ্যোতিকে গাড়িতে রেখে তিনি সেইদিকে চলতে লাগলেন।

চাতালের ওপরে যারা বসে ছিল তারা তাঁর দিকেই দেখছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ভদ্রলোক কাউকে নিয়ে এসেছেন রোগ দেখাতে।

একেবারে সামনের দিকের একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আসছি মতিহারি থেকে। শুনেছি এখানে এক সাধুবাবা আছেন। তিনি নাকি ওষুধ দিয়ে সকলের সব রোগ ভাল করে দেন।"

লোকটা বললে, "হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু সাধুবাবা তো নেই এখন।"

"কোথায় গেছেন?"

"তা জানি না।"

"কখন আসবেন?"

"তাও জানি না। আমরা তো তাঁর জন্যেই বসে আছি। এই এখানে যত লোক দেখছেন সবাই সেই সাধুবাবার জন্যেই বসে অপেক্ষা করছে।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তাহলে আমিও একটু অপেক্ষা করি তাঁর জন্যে।"

"তা করুন।"

চন্দ্রভানুবাবুর তখন বড় কষ্ট হচ্ছে। অনেক দূর থেকে এসে পৌঁছেছেন। কখন সেই ভোররাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। ঘন্টায় ষাট-সত্তর-আশি মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন, যাতে ঠিক সময়ে এখানে এসে পৌঁছতে পারেন। লোকের মুখে কত কথা শুনেছেন এই সাধুবাবার সম্বন্ধেই। যারাই সাধুবাবাকে রোগ দেখিয়েছে, তারাই অসুখ ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। এমন কী, অন্ধরাও নাকি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। সবাই তাঁকে বলেছে একবার ফুলডাঙার সাধুবাবার কাছে গিয়ে জ্যোতির

পা'টা দেখাতে।

আর ডাক্তার দেখাতেও তো তিনি কসুর করেননি। কলকাতা দিল্লি বোম্বাই, কোনও শহরই বাদ দেননি। টাকা খরচ করেছেন জলের মতো। যে যে-ডাক্তারকে দেখাতে বলেছে, তাকেই দেখিয়েছেন। পায়ের এক্স-রে যে কতবার হয়েছে ঠিক নেই। অনেক ডাক্তার বলেছে যে, বেশি দিন এভাবে পড়ে থাকলে পায়ে ক্যানসার হয়ে যাবে। তখন পা'টা কাটতেই হবে।

কিন্তু একমাত্র ছেলের বাবার পক্ষে কি তাতে প্রাণে ধরে রাজি হওয়া সম্ভব? কোন বাবা চায় যে, তার চোখের সামনে পা-কাটা ছেলে ঘুরে বেড়াক।

অনেকে বলেছে যে, আমেরিকায় গিয়ে পা কাটিয়ে কাঠের পা লাগিয়ে আনতে। এখানে এ-দেশেও কাঠের পা লাগিয়ে দেওয়া যায়। চন্দ্রভানুবাবুর টাকার অভাব নেই। যত টাকা লাগে তার জন্যে তিনি তা খরচ করতে তৈরি। মানুষ বোধহয় কোনও অবস্থাতেই সুখী নয়। অনেকের সুস্থ ছেলে আছে কিন্তু হয়ত তার টাকা নেই। আর যার টাকা আছে, তার হয়তো পুত্র-সুখ নেই। বহুদিন আগে সেই সাধু তো তাঁকে বলেই দিয়েছিল যে, তাঁর সংসার হবে কিন্তু সংসারে সুখ হবে না। সত্যিই তো তাই হল। কেন তাঁর তবে সংসার করবার ইচ্ছে হল। কেন তিনি ছেলে পাওয়ার জন্যে এত কষ্ট করলেন! ছেলে যদি কোনও রকমে একটা জোগাড়ই করলেন, তাহলে কেন তাঁর ছেলের এমন দুর্ঘটনা ঘটল?

মনেমনে সেই কথা ভাবতে-ভাবতেই তিনি আবার তাঁর গাড়িটার ভেতরে গিয়ে বসলেন।

জ্যোতি তখনও পায়ের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভেতরে হেলান দিয়ে বসে ছিল।

জিজ্ঞেস করলে, "কী হল, এত দেরি হল কেন তোমার আসতে? সাধুবাবা কী বললে?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন "একটু সহ্য করো বাবা, সাধুবাবা এখন মন্দিরে নেই। কোথায় গেছেন, একটু পরেই আসবেন।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "এ তো তোমার নিজের দোষেই এমন হল। তুমি কেন নিজে-নিজে গাড়ি চালাতে গেলে? তুমি তো ড্রাইভারকে ডাকলেই পারতে! ড্রাইভার কি আর তোমার কথা শুনত না ভেবেছ? এ তো সব তোমারই দোষ! এখন কাঁদলে কী হবে? এখন আমি কী করব?"

জ্যোতি আর কোনও কথা বললে না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঃ উঃ করতে লাগল।

⊙

সকাল থেকে দুপুর হল, দুপুর থেকে বিকেল হল। তারপর আবার খানিক পরে সন্ধেও হবে। কিন্তু তখনও সাধুবাবার দেখা নেই—

হঠাৎ মন্দিরের চাতালের ওপর যারা শুয়ে বসে, তাদের মধ্যে যেন একটু শোর-গোল শুরু হল!

চন্দ্রভানুবাবু গাড়িতে বসেই দেখতে পেলেন কে একজন ভদ্রলোক আসতেই সবাই তাঁকে ঘিরে ধরেছে। ঘিরে ধরে কী যেন সব কথা জিজ্ঞেস করছে।

চন্দ্রভানুবাবুরও কৌতূহল হল। তিনিও আর গাড়ির ভেতর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পাঁড়েজি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও কি সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন "হ্যাঁ, আমি সকালবেলা এসেছি। এখন বিকেল হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করছি!"

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"মতিহারি।"

"সে তো অনেক দূর। তা আপনার অসুখটা কী?"

"আমার অসুখ নয়, আমার ছেলের অসুখ। ছেলে ওই গাড়িতে বসে আছে। একটা মোটর-দুর্ঘটনায় তার পা ভেঙে গেছে। সে ভাল করে হাঁটতে পারে না। সব সময়ে তার যন্ত্রণা হয়। লোকের মুখে শুনেছি যে, এখানকার এই সাধুবাবা সব রকমের রোগ সারাতে পারেন। ডাক্তাররা বলছে ওর পা'টা কেটে ফেলতে। কিন্তু আমি রাজি নই। তাই সাধুবাবার কাছে একবার দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। দেখতাম তিনি কী বলেন।"

পাঁড়েজি বললেন, "কিন্তু সাধুবাবা তো নেই।"

"নেই মানে? শুনেছিলাম তো এখানেই

থাকেন তিনি।”

“হ্যাঁ, এতদিন এখানেই থাকতেন। আমিই তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে এনে আমার মন্দিরে স্থান দিয়েছিলুম। চারদিকের নানান গ্রাম থেকে তাঁর কাছে রোগী আসত অসুখ সারাবার জন্য, আর তিনিও সকলের রোগ সারিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ ভোর থেকে আর তাঁর খোঁজ পাচ্ছি না। এখন আমি তাঁকে খুঁজতেই তো গিয়েছিলাম। সমস্ত জায়গা খুঁজে এলাম, সব লোককে জিজ্ঞেস করে এলাম কেউ তাঁকে দেখেছে কিনা। কিন্তু না, কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। কেউ তাঁর কথা কিছু বলতে পারলে না।”

“তাহলে এখন কী হবে? এত লোক যারা তাঁকে রোগ দেখাতে এসেছে তাদের কী হবে?”

“কী হবে তা আমি কী করে বলব বলুন? আমি নিজেই তো তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি সেই ভোর থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে এখন বাড়ি ফিরছি। এখনও আমার চান করা হয়নি. এতক্ষণ আমি উপোস করে আছি।”

চন্দ্রভানুবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। এর পর ফিরে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় কী? জ্যোতির কপালে যা আছে তাই-ই হবে।

তিনি নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এলেন। তারপর গাড়ির ভেতরে এসে উঠে ড্রাইভারকে বললেন, “চলো, বাড়ি ফিরে চলো—”

জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, “কী হল? সাধুবাবা কী বললেন?”

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, “কী আর হবে! তোমার আর আমার কপাল! সাধুবাবা আজই ভোরে এখান থেকে কোথায় চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কাউকে বলে যাননি।”

দুজনেই চুপ। কারোর মুখে আর কোনও কথা নেই। গাড়িটা যেমন যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা ধরেই আবার ফিরে চলতে লাগল।

রাত তখন দুটো। ফুলডাঙার বাড়ির একটা ঘরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে দেবুর। ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখে সাধুবাবা বাইরে যাবার জন্যে তৈরি।

টপ করে উঠে দাঁড়াল দেবু।

“সাধুবাবা, কোথায় যাচ্ছ তুমি?”

সাধুবাবা বললেন, “আমি চলে যাচ্ছি রে—”

“কোথায়?”

“তা জানি না। কিন্তু এখানে আমার আর থাকা হবে না। রামজি আমাকে ডাকছে।”

“কিন্তু এখানকার রোগীদের কী হবে?

কাল যে ভোরবেলাই আবার অনেক লোক দূর-দূর জায়গা থেকে তোমার কাছে রোগ দেখাতে কষ্ট করে আসবে।"

"তা আমি কী করব। আমার রামজি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছে। পৃথিবী কত বড়, পৃথিবী কত বিরাট। আরো কত জায়গার লোক আমার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে, এ অবস্থায় আমাকে এই ফুলডাঙায় চুপ করে আটকে বসে থাকলে চলবে?"

দেবু বললে, "তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব সাধুবাবা। আমাকে ফেলে যেও না।"

"তুইও যাবি? তাহলে তৈরি হয়ে নে। দেরি হয়ে গেলে পাঁড়েজি আর এখানকার লোকেরা আর আমাদের চলে যেতে দেবে না। চল চল দেরি করিসনে, শিগগির চল—"

দেবু তৈরিই ছিল। সাধুবাবার সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ল। বললে, "কিন্তু সকাল-বেলা যখন কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না তখন কী ভাববে?

"যে যা ভাবে ভাবুক তা আমি ভাবতে বসব না। একদিন আমিও যখন বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিলুম তখন আমার বাবা-মা কী ভাববে তা ভাবিনি। রামজি আমাকে দিয়ে যা করাবে আমি তাই-ই করব। রামজি যে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছে।"

"কেন? কেন এখান থেকে রামজি তোমাকে চলে যেতে বলছে?"

সাধুবাবা বললেন, "তা রামজিই জানে। আমি রামজির চাকর। রামজি আমাকে যা হুকুম করবে আমি তাই-ই করব—"

ফুলডাঙা গ্রামটা তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। দিনের বেলা যে-ফুলডাঙা লোকে গিস-গিস্ করে, যে-ফুলডাঙার বাজারে লোকের খুব আনাগোনা, সেই ফুলডাঙার রাস্তায় তখন একটা লোকেরও নাম-গন্ধ নেই।

রাস্তাটা সোজা গিয়ে মস্ত বড় একটা বড় রাস্তায় মিশেছে। সাধুবাবা হনহন করে চলেছে। যাতে কেউ দেখতে না পায়, সূর্য ওঠবার আগেই পাঁচ-ছ মাইল রাস্তা পেরিয়ে চলে যেতে হবে।

চলতে চলতে সাধুবাবা বললেন, "অত আস্তে আস্তে আসছিস কেন। জোরে জোরে চল্!"

দেবু কিছু জবাব না দিয়ে আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে। সাধুবাবা এবার কোথায় যাবে কে জানে! বেশ তো আরামেই ছিল ফুলডাঙায়। খাওয়া-থাকার কোনও ভাবনা ছিল না। পাঁড়েজি তো সাধুবাবাকে খুব ভক্তি করত। রোজ ঘুম থেকে উঠে সাধু-বাবার কাছে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত! তবু কেন এত আরাম সইল না সাধুবাবার? কেন সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অনির্দিষ্টের উদ্দেশে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল! সাধুবাবার রামজি কে? কীরকম সেই রামজির চেহারা?

চলতে-চলতে হঠাৎ দেবু জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা সাধুবাবা, তুমি যে রামজি-রামজি করছ, তোমার রামজি কে?"

সাধুবাবা বললেন, "তুই তো এতদিন পরে হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললি! রামজি কে জানিস না তুই?"

"না সাধুবাবা, আমি রামজিকে সত্যিই জানি না।"

সাধুবাবা বললেন, "তবে শোন্, একটা গল্প বলি শোন্—" **(ক্রমশ)**

ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে। মজঃফরপুরে দুজন ইংরেজ মহিলা বোমায় মারা গেছেন। তারপরেই কলকাতার মানিকতলায় বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে ফেলল পুলিস। পুলিসের ধারণা, সন্ত্রাসবাদীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অরবিন্দ ঘোষ। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রেগান একদল পুলিস নিয়ে অরবিন্দকে ধরতে গেলেন মাঝ রাত্রে। খোলা রিভল্ভার হাতে অরবিন্দের ঘরে ঢুকে ক্রেগান দেখেন, খালি মেঝেতে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন তিনি। বুটের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ক্রেগান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো শিক্ষিত, এরকম ঘরে থাকতে লজ্জা করে না?" অরবিন্দ উত্তর দিলেন, "আমি যে গরিব!" মাথামোটা ক্রেগান বললেন, "ও, তা হলে বড়লোক হবার লোভেই এই সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন?" উত্তরে শুধু মুচকি হাসলেন অরবিন্দ।

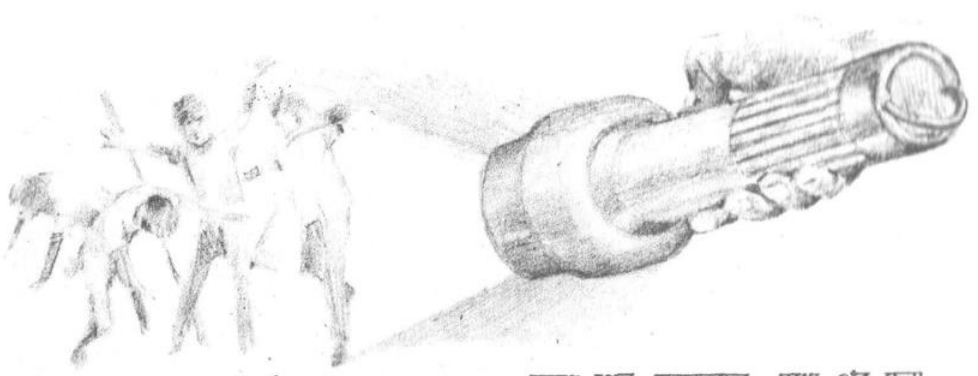

ক্লোরোফর্ম টর্চ

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

পুলিন দেখল, এবারেও ওদের টকটক দেওয়াল-ঘড়িটা রাত্রি দুটো বাজানোর কাজ শেষ করে এক পা মাত্র এগিয়েছে।

ঠিক সেবারের ডাকাতদলের মতোই একজন ডাকাত বাইরে লোহার জাল লাগানো জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে জোরালো টর্চের আলো ফেলেছে।

"রতনবাবু, দরজা খুলে দিন। দরজা ভেঙে ঢুকতে হলে আপনাদের একজনকেও আস্ত রাখব না কিন্তু!"

ডাকাতদের একজন ভারী গলায় পুলিনের বাবা, ঘুমন্ত রতনবাবুর উদ্দেশে বলে।

দু'বছর আগে রাত্রে ঠিক একই সময়ে ওদের বাড়িতে ডাকাতির কথা পুলিন এখনও ভুলতে পারেনি।

বাইরে দরজায় ঘা মারার শব্দ। ঘরের ভেতর থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ডাকাতরা একটা ভারী কুড়ুলের ঘা বসাল ওদের দরজায়।

তারপর দাঁতে দাঁত টিপে প্রচণ্ড রাগে একজন ডাকাত বলে ওঠে, "ঘাড়ের ওপর মাথাটা রাখতে চান তো মানে মানে দরজা খুলে দিন।"

রতনবাবুর বুঝতে দেরি হল না, ওদের এবারের লক্ষ্য ওঁর বড় মেয়ে উমা। উমা আজই এক-গা গয়না পরে বাপের বাড়ি এসেছে। পাছে রাত কাটলে তিনি গয়না অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন, তাই দেরি না করে ডাকাতরা সেই রাতেই পিছু-পিছু ধাওয়া করেছে।

বোঝা গেল, ডাকাতদের মধ্যে ওঁর চেনা মানুষও আছে। অবশ্য উনি জানেন, চেনা-জানা লোক না থাকলে ডাকাতি হয় না।

ডাকাতদের কথায় পুলিনের বাবা ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

না, ওরা মারধোর করেনি। চাবিকাঠি চেয়ে নিয়ে আলমারি থেকে রতনবাবুর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ধার নেওয়া টাকার তোড়া আর বাক্স থেকে পুলিনের মায়ের যাবতীয় সোনার গয়না নিয়ে ওরা চলে গিয়েছিল।

ডাকাতদের ডাকে বাড়ির সবারই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। পুলিন আর ওর বোন সুমা বসে বসে সব ব্যাপারই লক্ষ করেছিল সে রাতে।

ওরা চলে গেলে ওদের বাবা-মা ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। ওঁদের কান্না দেখে পুলিন আর সুমাও না কেঁদে পারেনি। বিশেষ করে ওদের বাবাকে ওরা কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি কিনা।

"শুনছেন? দরজা খুলবেন, না ভেঙে ঢুকব?" ডাকাতদের আর একজন কড়কড়ে গলায় বলে ওঠে।

ওর বাবার হয়ে পুলিনই এবারে জবাব দেয়, "না, খুলব না। সেবারে বড় বোকা বানিয়ে আমাদের সব কিছু নিয়ে পালিয়েছিলে। এবার আর সেটি হতে দিচ্ছি না!"

পুলিন চুপিসারে ওদের খাটের নীচে রেখে দেওয়া ওর নিজের বাক্সটা খুলে বার করেছিল ক্লোরোফর্ম টর্চলাইটটা। মাত্র ক'দিন আগে ও যেটা আবিষ্কার করেছে। ফোকাসের মুখে কাঁচের কোনো দরকার হয় না পুলিনের এই টর্চে। সুইচ অন করলেই এক ঝলক আলোর সঙ্গে ক্লোরোফর্ম গ্যাসের গোলা বন্দুকের মতো শব্দ

এই দুর্ঘটনা আপনারও হতে পারে। তাই আপনার পরিবার ও প্রিয়জনের নিরাপত্তার জন্য জনপ্রিয়র মাধ্যমে বিনাব্যয়ে দুইলক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

● শীঘ্রই নিম্নলিখিত স্থানে শাখা অফিস খোলা হচ্ছে :–

গঞ্জাম	আসানসোল
পাটনা	ধানবাদ
জামসেদপুর	রাঁচী
সম্বলপুর	হাজিপুর

● শাখা অফিস :–

কটক	বারিপোদা
বোকারো	রাউরকেল্লা
আজমগড়	বালেশ্বর
দিল্লী	মুজাফরপুর
গৌহাটি	আগরতলা
চুঁচুড়া	বহরমপুর
বর্ধমান	মেদিনীপুর
ডায়মণ্ডহারবার	কৃষ্ণনগর
ব্যারাকপুর	বোলপুর
বনগাঁ	মাল বাজার
কাকদ্বীপ	শিলিগুড়ি

জনপ্রিয়

ফিনান্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

(পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী) ফোন–২৪–০৮২৭

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার (৫ম তল)

৩৩এ জওহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলিকাতা ৭০০০৭১

পূর্বাঞ্চল অফিস :— পি-১৪৬ সি, আই, টি, রোড, কলিকাতা-৭০০, ০১০.

মধ্যাঞ্চল অফিস :— ১১৯ দীপ শিখা, রাজেন্দ্র প্লেস, নিউ দিল্লী-৮

করে ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ্যবস্তুর ওপর। লক্ষ্যবস্তুটি কোনো মানুষ বা জীব-জন্তু হলে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো একটা গোঙানির শব্দ ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে লুটিয়ে পড়তে হবে মাটির ওপর।

এবারেও পুলিনের বাবা রতনবাবু ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিতে যাচ্ছিলেন। পুলিন ওর বাবার হাতটা ধরে ফেলে বলে "না, দরজা খুলতে হবে না। আমি আজ একাই ওদের ঠান্ডা করে দেব।"

পুলিনের কথা শুনে মা কেঁদে ফেললেন। "না বাবা, যাসনি। তুই এইটুকু ছেলে। ডাকাতদের সামনে দাঁড়িয়ে কী করবি ? ওরা তোকে মেরে ফেলবে।"

পুলিন ওর আবিষ্কৃত ক্লোরোফর্ম টর্চটা মাকে দেখিয়ে রবিঠাকুরের 'বীরপুরুষ' কবিতার খোকার মতো লাফ দিয়ে বলে ওঠে "ভয় পেও না মা, যতক্ষণ পুলিন তোমার কাছে আছে।"

ও সন্তর্পণে চলে যায় পাশের ঘরের খোলা জানালার পাশে দুই ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে। ও-ঘরে তখন ওর দিদি উমা বোন সুমাকে জড়িয়ে ধরে ঠক-ঠক করে কাঁপছে বিছানার ওপর বসে বসে।

বাইরে অন্ধকারে মোটামুটি হদিস করে নিয়ে জানালার গরাদের ফাঁকে টর্চলাইটটা সেট করে পুলিন অন করে দেয় সুইচটা।

ব্যস, আর কোথা যায়। পুলিন দেখতে পেল, ওর ক্লোরোফর্ম টর্চের মাত্র এক ঝলক আলোয় পাঁচ-ছ'জন ডাকাত অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ল মাটিতে। তা দেখে বাকি কজন তাদের কাছে যেতে তাদের দশাও তা-ই হল।

ততক্ষণে পাশের ঘর থেকে পুলিনের বাবা-মা পুলিনের কাছে এসে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন।

পুলিন ও'দের বলে, "চেঁচামেচির কোনো দরকার নেই। সকাল হওয়ার আগে ওদের কারও জ্ঞান ফিরবে না।"

কথাগুলো বলে পুলিন হো-হো করে তৃপ্তির হাসি হেসে ওঠে। নিজের হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে পুলিন দেখে মা ওর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে দেওয়ালে লাগানো বড় আয়নাটা মুছছেন।

ছবি বিমল দাস

পিপলু ও অলিম্পিক

অশোককুমার মিত্র

এবারে অলিম্পিক
মস্কোয় বসছে,
প্রতিযোগী খেলুড়েরা
পাঁয়তারা কষছে।
দিনভর কসরত
সকালে কি বিকেলে,
কিসে বাড়ে হিম্মত,
ফিটনেস কী খেলে ?
দিনরাত ছুটোছুটি—
নেই কেউ সুস্থির,
বক্সিং-এ দড় কেউ,
কেউ প্যাঁচে কুস্তির।
কারো আছে দৌড়ঝাঁপ
কারো অসিচালনা
বন্দুক নিশানায়
কারো তাক ভাল না।
ফুটবলে কেউ পটু,
কেউ নৌ-চালানোয়,
গোলমাল দেখে কেউ
ভিড় ঠেলে পালানোয়।
কেউ মাতে ক্যারাটেতে,
কেউ কেউ জুডোতে,
পিপলুর মনোযোগ
সারাদিন লুডোতে।
এ-খেলায় তাকে নাকি
সোনা হবে জিততে,
প্রাকটিস চলে তার
একাগ্র চিত্তে।

১		■	২	■	৩	৪
	■	৫			■	
৬	৭	■		■	৮	
■	৯		■	১০		■
১১		■	১২	■	১৩	১৪
	■	১৫			■	
১৬		■		■	১৭	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) কোন্ আনাজ প্রাণীও বটে? (৩) পণ্ডিত। (৫) চতুষ্পদ প্রাণীরা আর যে-পদ হতে পারে। (৬) প্রতারক। (৮) 'জানলা দিয়ে ঘর পালায় গৃহস্থ হয় বন্ধ'—এই হেঁয়ালি যাদের নিয়ে তাদের একজন। (৯) রামায়ণের একটি স্ত্রী-চরিত্র। (১০) ইউরোপীয় দেশের রাজধানী, ইংরেজি উচ্চারণ অন্যরকম। (১১) প্রাচীন বঙ্গদেশ। (১৩) লাল ফুল-বিশেষ। (১৫) ধনুক। (১৬) নক্ষত্রবিশেষ। (১৭) যে-স্টেশনের নাম শুনলে হাই ওঠে।

উপর-নীচ : (১) কচ্ছপ। (২) মেরুদণ্ড। (৪) সাদা। (৭) পুরাণোক্ত পাখি। (৮) জলযান। (১১) এই ঋষি আর এঁর এক সত্যবাদী শিষ্যকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছেন। (১২) ধাতুনির্মিত পুরস্কার। (১৪) যে-ফল নৌকো চালায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

তা	মা	■	■	■	বা	জ
লা	টি	ম	■	■	ক	ম্বু
■	■	হ	রি	তা	ল	■
■	■	সী	■	ম	■	■
■	দি	ন	ক	র	■	■
ন	গ	■	■	স	ফ	র
দ	ন্ত	■	■	■	ল	ঘু

সেই-যে সেজদাদুকে ধাঁধা করতে বলা হয়েছিল, তখন থেকে তিনি ধাঁধায় বেশ জড়িয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝেই ছোটকাকে ঘিরে আসর জমান। আমরাও থাকি। বেশ মজার মজার ধাঁধা আর মজার মজার খেলা হয়। বিশেষ করে সেইসব দিনে, যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো থাকে না। ছাদে গিয়ে বসি আমরা, হ্যারিকেন সঙ্গে নিয়ে।

সেদিনও সেজদাদু যখন এলেন তখন সারা পাড়া জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমরা নিজেরাই এক জায়গায় বসে গল্প করছি। সেজদাদু সোজা চলে এলেন ওপরে। হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট।

ছোটকা বলল, "কী কিনলে?"

সেজদাদু বললেন, "কতগুলো ডটপেন কিনতে হল। ছাদের ওপর

স্পোর্টস হবে কাল, তার প্রাইজ কিনে আনলাম।"

সেজদাদুদের বাড়ির ছাদ আমাদের থেকে অনেক বড়। তবে স্পোর্টস হবার মতো বড় কিনা সন্দেহ আছে। সন্দেহ অবশ্য তখনি ঘুচে গেল। সেজদাদু হাসতে হাসতে বললেন, "ছোটদের এলেবেলে স্পোর্টস। তাই এলেবেলে প্রাইজ কিনে আনলাম।" ওরা জানেও না, প্রাইজ দেওয়া হবে, সেজদাদু নিজেই কিনে এনেছেন।

কখন যেন সেজদাদুর প্যাকেটটা খুলে ফেলেছে ছোড়দি। ১২টা পেন রয়েছে সাকুল্যে। নানা রঙের কমদামি পেন। তবে বাহারি। একটা পেন হাতে নিয়ে ছোড়দি জিজ্ঞাসা করল, "এটা কত নিল?"

সেজদাদু বললেন, "সব মিলিয়ে বারো টাকা লেগেছে বারোটা পেনে। তবে দামের হেরফের রয়েছে। কিছু পেন পঞ্চাশ পয়সা করে, কিছু দেড় টাকা করে, আর কয়েকটা দু-টাকা করে।"

হঠাৎ ছোটকা সেজদাদুকে অবাক করে বলে দিল, সেজদাদু কোন্ দামে কটা পেন কিনেছেন। পুরো বারো টাকার হিসেব মিলে গেল, মিলে গেল বারোটা পেনেরও হিসেব।

ছোটকা কীভাবে বলল, অনুমান করতে পার? কিংবা নিজেরাই বার করো-না উত্তরটা।

এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ টেলিফোন রয়েছে, অথচ টেলিফোন ডিরেক-টরিতে নাম ওঠেনি এমন লোকের সংখ্যা একটা শহরে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ। ধরা যাক, টেলিফোন গাইড খুলে এখান থেকে সেখান থেকে তিন শো নাম লিখে ফেললে কেউ। এই তালিকার মধ্যে শতকরা কতভাগ লোক থাকতে পারে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

৩, ৯; ৪, ১৬; ৫, ২৫; ৬, ?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও।

৩৫	৩৬	৪০
২১	১৮	২০
১৪	৯	১০
৭	১৪	?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ঢালা-ঢালির পর্যায়ক্রম নীচে দেখানো হল। পাত্র তিনটি ধরা যাক ক, খ ও গ।

ক	খ	গ
২৪	০	০
১৩	১১	০
১৩	৬	৫
১৮	৬	০
১৮	১	৫
২৩	১	০
২৩	০	১
১২	১১	১

২। বয়স ৪২। ৩। পূর্বদিক। ৪। ২২১।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

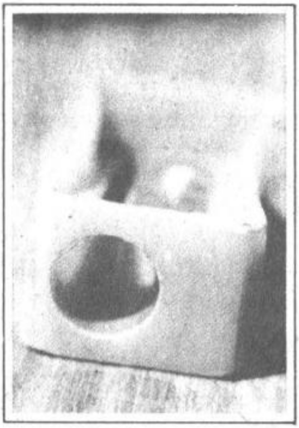

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ড্রামের উপর জোড়া কাঠির ফোটো।

ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ আয়নার দিকে তাকালে একসময় অনেক খবর পাওয়া যেত?

উঃ সমাচার-দর্পণ।

প্রঃ লোডশেডিং-এর জন্যে অন্ধকার হলে কাদের বাড়তি কোনো অসুবিধা হয় না।

উঃ রাতকানাদের।

প্রঃ আপনার সঙ্গে তো প্রতি শনিবারেই ডাক্তারবাবুর ওয়েটিং রুমে দেখা হয়, গত শনিবার যাননি কেন?

উঃ শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না।

প্রঃ দাঁতে হাত দিলে কী হয়?

উঃ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে বারণ করতে হয়।

সুসেন

মজার খেলা

জেমস্ বণ্ড-এর নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। দু-একজন তো পড়েই ফেলেছ, তাই না? এবার আমরা এমন দুটো খেলা শিখব যেখানে সংখ্যা থেকে পৌঁছে যাওয়া যায় সাহিত্যে।

নেহাতই কাগজ-পেনসিলের খেলা এগুলো। বন্ধুদের সঙ্গে কাটাকুটি খেলার মতোই খেলা যায়।

একটা কাগজে ইংরেজিতে লেখো প্রথম সংখ্যাটা। তারপর বলো, এই সংখ্যাটাকে তিন টানে বণ্ড বানাতে পারো? দেখবে, সে হয়তো ঘাবড়ে যাবে। এ কী করে সম্ভব।

আবার একটা কাগজে লেখো দ্বিতীয় সংখ্যাটি।

বন্ধুকে সংখ্যাটা দেখিয়ে বলো, দু-টানে সংখ্যাটাকে যাযাবর বানাতে পারো। এটাও দেখবে বন্ধুরা চট করে পারবে না।

আসলে সংখ্যা থেকে সাহিত্যে পৌঁছনোর খেলা জানলে খুব সহজ, না জানলে গোলমেলে।

তাই চুপি চুপি শিখে নাও কী করে সংখ্যাগুলো পালটে দেবে। তারপর বন্ধুদের দেখিয়ে মজা করো।

(১) 10111

BOND

(২) 11010

HOBO

হোবো মানে জানো না? অভিধান দেখে নাও চট করে।

মজারু

হাসিখুশি

সারা রাত ধরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান চলছে। এক ভারতবিখ্যাত তবলচির তবলা-লহরা শুরু হবে। তিনি হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে বাঁয়া-তবলা ঠিকঠাক করছেন। এক তন্দ্রালু শ্রোতা সেই শব্দ শুনে দারুণ সমঝদারের মতো 'আহা-হা' বলে আবেগে উথলে উঠলেন। পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

শিক্ষক : বলো তো 'আমি দুধ খাই'—এই বাক্যের দুধ শব্দটি কোন কারক?

ছাত্র : বলকারক, স্যার।

এক সিনেমা হলে—

: দাদা, আজকের ইভনিং শো-এর দুটো টিকিট দিন তো।

: হাউসফুল।

: ঠিক আছে, ওরই দুটো দিন।

শিক্ষক : তাহলে তোমরা শিখলে জল দেয় যে জলদ, আর কর দেয় যে করদ। আচ্ছা, এরকম আর দুটো উদাহরণ তোমরা দিতে পার?

ছাত্র : হ্যাঁ স্যার। বল দেয় যে বলদ, আর মরতে জানে যে মরদ।

ছবি দেবাশিস দেব

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥২৫॥

গম্বুজের জানলাটার কাছেই বসে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রানা, সেইরকমভাবেই কেটে গেছে সারারাত। টমাস ত্রিভুবন এসে ঘুমিয়ে ছিলেন নীচে। ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠলেন তিনিই আগে। স্পিরিট ল্যাম্প জেবলে চা বানালেন, তারপর এক কাপ চা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ডাকলেন রানাকে।

রানা আড়মোড়া ভেঙে চোখ কচলে বাইরের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "লুক, টমাস, লুক!"

টমাস ত্রিভুবন তাড়াতাড়ি এসে মুখ বাড়ালেন জানলা দিয়ে। তিনিও চমকে উঠলেন প্রথমে।

ইয়েতিরা লোফালুফি করে কিছুক্ষণ খেলবার পর মিংমাকে ফেলে গিয়েছিল মাটিতে। তখন রানা আর ত্রিভুবন ধরেই নিয়েছিলেন যে, মিংমা আর বেঁচে নেই। কিন্তু মিংমা কখন যেন উঠে বসেছে। রাত্রে কোনো এক সময় বরফ পড়েছিল। সেই বরফ জমে আছে মিংমার মাথায়, কাঁধে, পিঠের ওপর। এমনই নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে মিংমা যে, মনে হয় যেন রাত্রিতে ঠাণ্ডায় জমে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সে।

রানা জিভ দিয়ে আফশোসের শব্দ করে বললেন, "পুয়োর ফেলো, আহা বেচারা!"

ত্রিভুবন বললেন, "মরে গেছে ভাবছেন? আমার কিন্তু তা মনে হয় না!"

"সারারাত বাইরে বরফের মধ্যে পড়ে থাকলে কেউ বাঁচতে পারে?"

"শেরপাদের কতখানি জীবনীশক্তি তা বোধহয় আপনি ঠিক জানেন না। আমি ওদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি তো, আমি দেখেছি, ওরা মৃত্যুর কাছে কিছুতেই হার মানতে চায় না।"

তিনি দুটো হাত মুখের কাছে এনে খুব জোরে চিৎকার করলেন, "মিংমা! মিংমা! মি-ং-মা!"

মিংমার শরীরটা একটুও নড়ল না তাতে। তখন ত্রিভুবন ও রানা দুজনে মিলে একসঙ্গে ডাকতে লাগলেন মিংমার নাম ধরে। তাতেও কাজ হল না কিছুই।

ত্রিভুবন বললেন, "একটা বন্দুক বা রিভলভার দিয়ে যদি ফায়ার করা যেত, তাহলে সেই শব্দ শুনে ও জাগত নিশ্চয়ই।"

রানা হতাশ ভাবে বললেন, "বৃথা চেষ্টা! ঐ রকমভাবে কোনো মানুষ বসে থাকে? দেখছেন, একটুও নড়ছে না!"

ত্রিভুবন কোনো কথা না বলে নেমে গেলেন নীচে। একটু পরেই তিনি একটা সাঁড়াশি, একটা ছোট হাতুড়ি, কয়েকটা চীজ-ভর্তি টিন হাতে ওপরে উঠে এলেন আবার। রানাকে বললেন, "আমি বুড়ো হয়েছি, ঠিক ছুঁড়তে পারব না, আপনি এগুলো টিপ্ করে ছুঁড়ে মিংমার গায়ে লাগাতে পারবেন? মিংমা যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে তো আমাদের এখান থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই নেই।"

রানা জানলাটার একটা কাচের পাল্লা খুলে দিলেন ভাল করে। খুব ঘন-ঘন লোহার শিক বসানো বলে ভাল করে বাইরে হাত বাড়ানো যায় না। এই অবস্থায় এখান থেকে কিছু টিপ করে বাইরে ছোঁড়া খুই শক্ত।

তবু ভার্মা খুব সাবধানে টিপ করে একটা চীজের টিন ছুঁড়ে মারলেন। সেটা গিয়ে পড়ল অনেক দূরে। পর-পর তিন-চারটে জিনিসই সেরকম হল।

ত্রিভুবন বললেন, "আপনি একটু সরুন তো, দেখি আমি একবার চেষ্টা করি।"

বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ত্রিভুবন ছুঁড়ে মারলেন সাঁড়াশিটা। সেটা গিয়ে ঠিক লাগল মিংমার পিঠে। খানিকটা বরফও খসে পড়ল, কিন্তু মিংমার শরীরে কোনো স্পন্দন দেখা গেল না।

রানা ত্রিভুবনের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "আঘাতটা তেমন জোর হয়নি, আরও জোরে মারতে হবে।"

আরও তিনবার চেষ্টা করার পর আবার একটা টিন লাগল মিংমার মাথায়। তখন তার শরীরটা ধপ করে পড়ে গেল

বরফের ওপরে।

ত্রিভুবন আর রানা সঙ্গে-সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডেকে উঠলেন, "মিং-মা? মিং-মা?"

মিংমা আস্তে আস্তে মুখটা ফেরাল এবার।

আনন্দে, উত্তেজনায় রানার হাত চেপে ধরে ত্রিভুবন বলে উঠলেন, "দেখলেন, দেখলেন, আমি আপনাকে বলেছিলুম না...শেরপাদের জীবনীশক্তি!"

রানা চেঁচিয়ে উঠলেন, "মিং-মা, মিং-মা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? গম্বুজের দরজাটা খুলে দাও!"

শোয়া অবস্থা থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসল মিংমা। দেখলেই বোঝা যায়, তার শরীরে এখন একটুও শক্তি নেই। দু'হাত তুলে সে কী যেন বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু এতই ক্ষীণ তার গলার আওয়াজ যে, কিছুই বোঝা গেল না।

ত্রিভুবন বললেন, "মিংমা, লক্ষ্মী ভাইটি, একটু কষ্ট করে এসো, দরজা খুলে বার করে দাও আমাদের।"

মিংমা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, পড়ে গেল ধপ করে।

ত্রিভুবন বললেন, "মিংমা, চেষ্টা করো, তোমাকে পারতেই হবে, গম্বুজের মধ্যে এলে তুমি আগুনের সেঁক নেবে, গরম চা পাবে, ব্র্যান্ডি, ওষুধ..."

মিংমা দাঁত চেপে দুই কনুইতে ভর দিয়ে উপুড় হল, তারপর সেই অবস্থায় বুকে হেঁটে এগোবার চেষ্টা করল গম্বুজের দিকে। তিন চার ফুট কোনোক্রমে সেইভাবে এসেই আবার নেতিয়ে গেল তার মাথা, শুয়ে পড়ল কাত হয়ে।

রানা বললেন, "যাঃ, শেষ হয়ে গেল!"

ত্রিভুবন বললেন, "না, বিশ্রাম নিচ্ছে! একটু বেশি সময় লাগলেও ক্ষতি নেই।"

সত্যিই খানিকটা পরে ফের মুখ তুলল মিংমা। আবার সেইভাবে এগুবার চেষ্টা করল। একটুখানি যায়, আবার বিশ্রাম নেয়। এইরকমভাবে গম্বুজের কাছাকাছি এসে পড়ে একবার সে বিশ্রামের জন্য সেই যে মাথা নোয়াল, আর তোলেই না। কেটে গেল দশ-বারো মিনিট। অধীর উৎকণ্ঠায় রানা আর ত্রিভুবন যেন আর থাকতে পারছেন না। রানা তাঁর ঠোঁট এমনভাবে কামড়ে ধরেছেন যেন রক্ত বেরিয়ে যাবে।

ত্রিভুবন বললেন, "কী হল, মিংমা? আর একটুখানি!"

মুখ তুলে অসহায় চোখ দুটি মেলে মিংমা বলল, "আমি আর পারছি না, সাব! আমার শরীরে আর একটুও তাগত নেই!"

রানা বললেন, "পারতেই হবে, মিংমা! একটু-একটু করে এসে, দরজাটা খুলে দিলে তুমিও বাঁচবে, আমরাও বাঁচব!"

মিংমা প্রাণপণে খানিকটা চেষ্টা করেও এমনভাব ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ে গেল যে, বোঝা যায়, ওর জ্ঞান চলে গেছে!

ত্রিভুবন বললেন, "ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু মানুষের সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে!"

"অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই।"

দু'জনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিংমার দিকে। শরীরটা একটুও নড়ছে না, বুকের নিশ্বাস পড়ছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

ত্রিভুবন বললেন, "এরকমভাবে চেয়ে থাকতে-থাকতে যে আমাদের চোখ ব্যথা হয়ে যাবে! দাঁড়ান, আর একটু চা করে আনি—"

ত্রিভুবন নীচে নামবার জন্য ফিরতেই রানা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, "দাঁড়ান, শুনতে পাচ্ছেন?"

"কী?"

"শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না?"

"কই, না তো! কিসের শব্দ শুনব এখানে? বেশি উত্তেজিত হয়ে মাথাটা খারাপ করবেন না। ধৈর্য ধরা ছাড়া আমাদের আর এখন কোনো উপায় নেই!"

"ঐ যে শুনুন, ভাল করে শুনুন!"

এবার সত্যিই শোনা গেল গোঁ গোঁ আর ফট ফট ফট ফট শব্দ। খুব তাড়াতাড়ি সেই শব্দ কাছে এসে পড়ল। তারপরই দেখা গেল দুটো হেলিকপ্টার!

রানা আর ত্রিভুবন আনন্দে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন।

দুটো হেলিকপ্টার থেকে এগারোজন মিলিটারি নেমেই সারবন্দী হয়ে ছুটে আসতে লাগল গম্বুজটার দিকে। ত্রিভুবন আর রানা জানলা দিয়ে রুমাল ওড়াতে লাগলেন ওদের

চোখ টানবার জন্য।

গম্বুজের দরজাটা খুলে যেতেই আগে কোন কথা না বলে ও'রা দু'জন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এলেন মিংমাকে। ভেতরে এসেই মিংমার ঠোঁট ফাঁক করে তার গলায় ঢেলে দিলেন খানিকটা ব্র্যান্ডি। সস্‌প্যানে করে গরম জল ঢালতে লাগলেন তার গায়ে। মিলিটারিদের মধ্যে দু'জন মিংমার বুকে ম্যাসাজ করে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে লাগল।

ত্রিভুবন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক্, বেঁচে যে আছে, তাই যথেষ্ট। আর কোনো চিন্তা নেই।"

বীরেন্দ্র নামে একজন ব্রিগেডিয়ার দশজন কমাণ্ডো নিয়ে এসেছেন বিপদ থেকে উদ্ধারের কাজে। এই কমাণ্ডোদের এমনই ট্রেনিং যে, এরা এক-একজনই অন্তত দশ-পনরোজনের সমান লড়াই করতে পারে। এরা জানে না এমন কোনো কাজ নেই।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "এবার আমাদের লাইন অব অ্যাকশান কী হবে, বলুন?"

ত্রিভুবন বললেন, "আমি যতদূর বুঝেছি, এখানে এক জায়গায় বেশ বড় কয়েকটা গুহা ছিল, আমি নিজেও দেখে গেছি এক সময়। এখন সেই গুহাগুলো নেই। কোনো ফরেন এজেন্সি সেই গুহাগুলো ঢেকে দিয়ে মাটির নীচে গুপ্ত আস্তানা বানিয়েছে। মিঃ রায়চৌধুরী আর সন্তু সেখানে বন্দী। মিংমা একটা লোহার দরজার কথা বলেছিল, সেটা ব্লাস্ট করে ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনাদের সঙ্গে ডিনামাইট আছে কি?"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র বললেন, "পাহাড়ে রেসকিউ অপারেশনে এসেছি, আর ডিনামাইট স্টিক সঙ্গে থাকবে না, এ আপনি ভাবলেন কী করে?"

রানা বললেন, "কিন্তু সেই লোহার দরজাটা খুঁজে বার করার জন্য মিংমার সাহায্য দরকার।"

ওঁরা সবাই মিংমার দিকে তাকালেন। মিংমা চোখ মেলেছে।

ত্রিভুবন বললেন, "মিংমা, তুমি যে আমাদের সেই লোহার দরজাটার কথা বলেছিলে, সেটা কোন্ জায়গায় দেখিয়ে দিতে পারবে?"

মিংমা বললেন, "হ্যাঁ, পারব।"

তারপরই তার চোখে জল এসে গেল। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল, "আপনারা সন্তু সাব, আর আংকল্ সাবকে বাঁচান। আমি উঠতে পারছি না। আমার দুটো পা থেকেই জোর চলে গেছে! আমি আর কোনোদিন হাঁটতে পারব না।"

ত্রিভুবন বললেন, "নিশ্চয়ই পারবে! দু' একদিন বিশ্রাম নিলে আর ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমরা তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব, তুমি সেই জায়গাটা দেখিয়ে দাও!"

দু'জন কমাণ্ডো মিংমাকে কাঁধে তুলে নিল। ওরা বেরিয়ে পড়ল সবাই। এত অসুস্থ অবস্থাতেও মিংমা জায়গাটা চিনতে ভুল করল না। কাল রাতে বরফ পড়ে সব জায়গা প্রায় একাকার হয়ে গেছে। সকালের রোদ্দুরে কিছু বরফ গলতেও শুরু করে দিয়েছে।

মিংমার দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটার কয়েকজন কমাণ্ডো বরফ খুঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল লোহার দরজাটা। চটপট সেই দরজাটার চারদিকে বসিয়ে দেওয়া হল চারটে ডিনামাইট স্টিক। মিংমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অনেক দূরে। অন্যরাও ছড়িয়ে পড়ল দূরে-দূরে। ডিনামাইট চার্জ করার পর কতদূর পর্যন্ত ছিটকে আসতে পারে তা হিসেব করে কমাণ্ডোরা সবাইকে সেই নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে বলল। কয়েকজন কমাণ্ডো তৈরি হয়ে রইল হাতের মেশিনগান উঁচিয়ে।

রানা আর ত্রিভুবন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন। ডিনামাইট চার্জ করার আগেই তাঁরা কানে হাত চাপা দেবার জন্য তৈরি। ঠিক এই সময় তাঁরা শুনতে পেলেন পেছন দিকে একটা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাক।

দু'জনেই দারুণ চমকে গেলেন। এই বরফের রাজ্যে কুকুর? পেছন দিকে তাকিয়ে তাঁদের মনে হল, সেখান থেকেও বেশ খানিকটা দূরে একটা কুকুর প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে।

ত্রিভুবন বললেন, "কুকুর যখন আছে, তখন মানুষও আছে ওখানে!"

তাঁর কথা বলা শেষ হতে না হতেই ডিনামাইটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল!

ওদিকে গুহার মধ্যে কাকাবাবু যে যন্ত্র-ঘরটার মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সে-ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কেইন শিপটন অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আগুনে সেই লোহার দরজার একটা অংশ গলিয়ে ফেলেছে। লম্বা নলওয়ালা একটা পিস্তল হাতে নিয়ে প্রথমে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কেইন শিপটন। তার পেছনে অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে একজন মুখোশধারী সহচর।

ঘরের ছাদটা খোলা দেখে রাগে-ক্ষোভে একসঙ্গে অনেকগুলো গালাগালি দিয়ে উঠল কেইন শিপটন! তার প্রিয় কুকুরটা বাইরে, ওপরে চ্যাঁচাচ্ছে।

সে বলে উঠল, "ড্যাম ইট! দ্যাট ফেলো এসকেপ্‌ড! ঐ বদমাস রায়চৌধুরীটাকে ক্যাপচার করতেই হবে! ও যেন কিছুতেই পালাতে না পারে"

তারপর সহচরটিকে হুকুম দিল, "শিগগিরই নাম্বার ফোর, নাম্বার সেভেন আর নাম্বার নাইনকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। বাইরে যেতে হবে।"

সহচরটি চলে যেতেই কেইন শিপ্‌টন শিস্ দিয়ে ডাকল, "ডোগি, ডোগি, কাম হিয়ার।"

কুকুরটা কিন্তু ডাকতে-ডাকতে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

কেইন শিপ্‌টনের লম্বা ছিপছিপে চেহারা, সে ইচ্ছে করলেই লাফিয়ে খোলা ছাদের এক পাশের দেয়াল ধরে ফেলতে পারে। সেই রকমই করবার জন্য

তৈরি হয়ে সে পিস্তলটাকে দাঁতে কামড়ে ধরল, তারপর লাফ দেবার জন্য যে-ই নিচু হয়েছে, অমনি পেছন থেকে শক্ত লোহার মতন দুটো হাত টিপে ধরল তার গলা।

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে, কিছু বুঝবার আগেই যেন কেইন শিপ্‌টনের দম বন্ধ হয়ে এল, মাথা ঝাঁকুনি দিয়েও সে কিছুতেই ছাড়াতে পারল না নিজেকে। চোয়াল আল্‌গা হয়ে গিয়ে পিস্তলটা ঠকাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার কানের পাশে ঠাণ্ডা গলায় কে একজন বলল, "ইয়োর গেম ইজ আপ্‌, কেইন্‌ শিপটন!"

রহস্যময় যন্ত্রটার পাশে অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন কাকাবাবু। ঘরের ছাদটা খুলে গেলেও খোঁড়া পায়ে কাকাবাবু লাফিয়ে উঠতে পারতেন না ওপরে। তিনি ঠিকই করে রেখেছিলেন, ঘরে ঢুকে কেইন শিপ্‌টন তাঁকে দেখা মাত্র তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন যন্ত্রটার ওপরে, এক সঙ্গে সব কটা বোতাম টিপে দেবেন। তাতে সবসুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক্‌।

কিন্তু ছাদটা খোলা দেখে, বিশেষত বাইরে কুকুরের ডাক শুনে কেইন শিপ্‌টন আর ঘরের ভেতরটা ভাল করে খুঁজে দেখেনি। একটু অসতর্কও হয়ে পড়েছিল সে। সেই সুযোগ নিয়ে কাকাবাবু বজ্র আঁটুনি দিয়েছেন তার গলায়।

কাকাবাবু টেনে কেইন শিপ্‌টনকে দেয়ালের দিকে নিয়ে আসতে লাগলেন। কেইন শিপ্‌টনের গায়েও জোর কম নয়। তার সঙ্গে কাকাবাবু বেশিক্ষণ যুঝতে পারবেন না। কোনক্রমে একবার মাটি থেকে পিস্তলটা তুলে নিতে পারলেই হল।

কেইন শিপটনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, তবু সে শরীরের সব শক্তি এক জায়গায় করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে গেল একবার।

তার আগেই প্রলয় কিংবা মহাভূমিকম্পের মতন প্রচণ্ড শব্দে সব কিছু কেঁপে উঠল, কাকাবাবু আর কেইন শিপ্‌টন দু'জনে ছিট্‌কে পড়লেন দু'দিকে।

ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়তে লাগল, ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সব-কিছু। এক মুহূর্তের জন্য কাকাবাবুর মনে হল, তিনি যেন পাথরের স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছেন, তারপরই তাঁর জ্ঞান চলে গেল।

ডিনামাইট চার্জে ওপরের ইস্পাতের দরজাটা উড়ে যেতেই গুহার ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেল কমাণ্ডোরা। প্রথমে তারা সাব-মেশিনগান থেকে এক ঝাঁক গুলি চালাল, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ল নিজেরা।

বিস্ফোরণের আওয়াজে ভেতরের মুখোশধারী লোকগুলো একটুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। দু'তিনজন পাথরের টুকরোর ঘা খেয়ে আহত হল। তারপরই কমাণ্ডোরা এসে পড়ায় শুরু হয়ে গেল খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু কমাণ্ডোরা ভেতরে ঘুরতে লাগল যেন ঝড়ের বেগে, কয়েকজন মুখোশধারী আহত হবার পর বাকিরা আত্মসমর্পণ করতে লাগল একে একে।

সন্তুকে যারা ধরতে এসেছিল, তারা আরও অনেকখানি নীচে ছিল বলে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেনি প্রথমে। দু'জন সন্তুকে ধরে রইল, রিভলভার দিয়ে সাব্‌-মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না বুঝতে পেরে তারা রিভলভার ফেলে দিয়ে দু'হাত উঁচু করে ধরা দিল।

সন্তুর কাছে যে দু'জন রইল, তাদের এক-জন সন্তুর ডানপাশ থেকে তার কপালের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে ধরেছে। আর-একজন রিভলভার উঁচিয়ে রইল সন্তুর পেছনে। তার-পর পেছনের লোকটি সন্তুকে হুকুম দিল, "নাউ মুভ্‌, ওয়াক্‌ স্ট্রেট অ্যাহেড, কোনো রকম চালাকি করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাব।"

সন্তু এক পা এক পা করে হাঁটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে গেল বলে তার মন খারাপ লাগছে। ওপরে কারা গোলাগুলি চালিয়েছে, তাও সে ঠিক বুঝতে পারেনি। সিঁড়িটার কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল কমাণ্ডোদের।

একজন মুখোশধারী চেঁচিয়ে বলল, "ইফ ইউ ট্রাই টু হোল্ড আস্‌, উই উইল শুট দিস বয়! আমাদের রাস্তা ছেড়ে দাও, নইলে এই ছেলেটা আগে মরবে!"

কমাণ্ডোরা থমকে গেল। মুখোশধারীদের হুকুমে সন্তু উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। একবার সে চোখ তুলে দেখতে পেল রানাকে। এই একজন চেনা লোককে

মিলিটারিদের সঙ্গে দেখেই সে সব বুঝতে পারল।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্রর কানে-কানে রানা কী যেন বললেন। বীরেন্দ্র ঘাড় নাড়লেন। মুখোশধারীরা সন্তুকে নিয়ে চলে এল ওঁদের কাছে। একজন বলল, "আমরা এই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাব। তোমরা আট্‌কাবার চেষ্টা করলেই ওকে আর বাঁচাতে পারবে না!"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রায়চৌধুরী কোথায়?"

সন্তুই উত্তর দিল, "কাকাবাবু ঐ বাঁ দিকের ঘরটার মধ্যে আছেন বোধহয়।"

রানা পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "সন্তু, ভয় পেও না, ঠিক সাত পা যাবার পর তুমি মাটিতে বসে পড়বে!"

সন্তুর মাথার পাশে আর পেছনে দুটো রিভলভার। সে পা গুনতে লাগলো, এক... দুই...তিন...চার...

সাত গোনার পর সে বসে পড়তেই এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল। সন্তুর ধারণা হল, সে নিজেও বুঝি এফোঁড় - ওফোঁড় হয়ে গেছে গুলিতে। মাটিতে তিন পাক গড়িয়ে গেল সে। তারপরই উঠে দাঁড়াল, তার কিছু হয়নি। মুখোশধারী দু'জন মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

সেদিকে তাকাবার সময় নেই সন্তুর, সে ছুটে এল রানার দিকে। রানা আর ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র দু'জনেই বললেন, "তোমার লাগেনি তো? যাক্—"

রানা বললেন, "সেই বিশ্বাসঘাতক ভার্মাটা কোথায়? এখানেই আছে নিশ্চয়, তাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

সন্তু ঢুকে গেল উঁচু বেদী-মতন জায়গাটার পাশের ঘরটায়। এইখানে দাঁড়িয়েই কেইন শিপটন কাকাবাবুকে ভয় দেখাচ্ছিল। রানা আর বীরেন্দ্রও সন্তুর সঙ্গে সঙ্গে এলেন সেই ঘরটার মধ্যে। ঘরের ছাদটা খোলা দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল প্রথমেই। তারপরই ওরা দেখতে পেল একটা বিশাল যন্ত্রের ঠিক সামনে কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর গায়ের ওপর ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো দেয়াল-ভাঙা পাথরের টুকরো।

সন্তু হাঁটু গেড়ে বসে ডাকছিল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

দু'তিনবার ঝাঁকুনি দিতেই কাকাবাবু চোখ মেললেন। তারপরই উঠে বসে বললেন, "সে কোথায় গেল? কেইন শিপ্‌টন?"

রানা জিজ্ঞেস করলেন, "সে কে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই তো পালের গোদা! এখানেই ছিল, তাকে কাবু করেছিলাম প্রায়...তারপর...কুকুরটাও ডাকছে না আর... সে নিশ্চয়ই এই পথ দিয়ে পালিয়েছে..."

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র দু'জন কমাণ্ডোকে এ-ঘরে ডেকে আনলেন। তারা চটপট লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে। ওপর থেকে জানাল যে, সেখানে একজন মানুষের পায়ের ছাপ আছে বরফের ওপরে।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র বললেন, "তাহলে তো ওকে ধরতেই হবে। কিছুতেই পালাতে দেওয়া চলবে না! আর ইউ অল রাইট, মিঃ রায়চৌধুরী? কেইন শিপ্‌টনকে ধরবার জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকাবাবু বললেন, "না! আমি আর যাব না, যথেষ্ট হয়েছে?"

রানা বললেন, "আমরাও ওপরে একটা কুকুরের ডাক শুনেছিলুম বটে...সেদিকে আর মন দিতে পারিনি...অবশ্য এখানে একা-একা কেইন শিপটন আর পালাবে কী করে? ধরা সে পড়বেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ধরা পড়ুক না পড়ুক, সে-সব এখন আপনাদের দায়িত্ব। আমি চেয়েছিলাম ওদের গোপন আস্তানাটা খুঁজে বার করতে। সেটুকু তো অন্তত পেরেছি! সেটুকুই যথেষ্ট!"

এতক্ষণ বাদে তিনি যেন সন্তুকে দেখতে পেলেন। সন্তুর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুই ঠিকঠাক আছিস তো সন্তু? লাগেনি তো তোর? বাঃ! এখনো তোর একটা কাজ বাকি আছে। খুঁজে দ্যাখ তো আমার ক্রাচ্ দুটো কোথায়? কাছাকাছিই কোথাও হবে হয় তো!"

রানা বললেন, "আপনার ঐ ভার্মা লোকটা কী করেছে জানেন? সে যে এদেরই দলের লোক, তা বুঝেছিলেন?"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "থাক্, ওসব কথা পরে শুনব। এখন কোনোভাবে একটু চা খাওয়াতে পারেন?" মনে হচ্ছে কতদিন যেন চা খাইনি! এ ব্যাটাদের এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে কিনা বলতে পারেন?"

রানার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি

লুকোনো পাঁচটি ঘুড়ি খোঁজো। পেরেছ?

ফুটকিগুলো জুড়ে দিলেই পাখি। তাই না?

বললেন, "আপনি বলেন কী, মিঃ রায়চৌধুরী! এত গোলাগুলি, মারামারির মধ্যে আমি চায়ের খোঁজ করব?"

কাকাবাবুর যেন এখন আর অন্য কোনো বিষয়েই কোনো আগ্রহ নেই। তিনি আবার বললেন, "এখন একটু চায়ের জন্য মনটা খুব ছটফট করছে। ওপরে আমাদের গম্বুজে স্টোরে ভাল চা আছে। চলুন, সেখানে গিয়ে আমি নিজেই আপনাদের চা তৈরি করে খাওয়াব! তারপর আমি কয়েক ঘণ্টা বেশ ভাল করে ঘুম লাগাব। যথেষ্ট ধকল গেছে, এবার একটু ঘুম দরকার। বুঝলেন, মিঃ রানা, ঘুমের মতন এমন ভাল জিনিস আর কিছু নেই। আমি তো অলস ধরনের লোক, ঘুমোতে খুব ভালবাসি!"

রানা এবার জোরে হেসে উঠে বললেন, "যা বলেছেন! আপনি অলসই বটে! খোঁড়া পা নিয়ে হিমালয়ের এতখানি ওপরে এসে আপনি একটা রেকর্ড সৃষ্টি করলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "পঙ্গুরাও গিরি লঙ্ঘন করে, এমন একটা কথা আছে জানেন না?"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র তাঁর কমান্ডোদের নানারকম নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলেন। কয়েকজন এরই মধ্যে চলে গেছে কেইন শিপটনের খোঁজে। তিনি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে মোট কতজন লোক ছিল, আপনি বলতে পারেন? ঢোকার-বেরুবার রাস্তা ক'টা? ওরা কি আপনার ওপর টর্চার করেছে?"

কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "এখন নয়, এখন ওসব কথা আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না। বললুম না, আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে, আর ঘুম পাচ্ছে।"

এই সময় সন্তু ক্রাচ দুটো খুঁজে এনে দিতেই তিনি খুব খুশি হয়ে উঠে বললেন, "বাঃ, আর কী চাই! চমৎকার! চলুন, মিঃ রানা। এবার ওপরে গিয়ে পৃথিবীটাকে একটু ভাল করে দেখি, একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই! চল রে, সন্তু! তুই এবার দারুণ কাণ্ড করেছিস!"

কাকাবাবু আদর করে এক হাতে সন্তুর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন।

(সমাপ্ত)

বিধানসভা

কিছুদিন আগে আমি, বাবা ও মায়ের সঙ্গে বিধানসভায় গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে 'অতিথি পাস' ছিল।

বিধানসভার ভেতরটা দেখতে খুব সুন্দর। গোল গম্বুজের চারদিকে নকশা। ভেতরে আলোও আছে প্রচুর। বিধানসভার অধ্যক্ষ নিজের আসনে বসে সভা পরিচালনা করেন। প্রত্যেক সদস্যের নির্দিষ্ট আসন রয়েছে। প্রত্যেকের সামনে মাইক। সবাই নিজের নিজের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে মাইকে কথা বলেন।

আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ-সংকট চলছে। ভেতরে ঢুকে শুনলাম, বিধানসভার সদস্যরা

ঐ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক-এক করে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তারপর সাধারণ প্রশাসন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে বিতর্ক হল।

অধ্যক্ষ ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করতে গিয়ে ভোট নেন। ভোট নেওয়ার পদ্ধতি খুব সুন্দর। প্রত্যেক সদস্য তাঁর আসনে বসে 'সুইচ' টিপে ভোট দেন। একটি বোর্ডে লাল ও হলুদ আলো জ্বলে ওঠে এবং ভোটের ফলও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।

মাঝেমধ্যে সরকার ও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের টীকা-টিপ্পনী খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। আমরা সন্ধেবেলায় বিধানসভা থেকে বাড়ি ফিরে আসি।

সুদীপ্ত চক্রবর্তী (বয়স ১০)

ভাল বাঘ

একটা বাঘ ছিল। বাঘটা জঙ্গল দিয়ে যেতে যেতে জলে পড়ে গেল। তারপর একটা জাহাজে উঠে বসল। জাহাজের লোকগুলোকে সে খেল না। বাঘটা ভাল ছিল। সে খেঁকির মতো ভাল ছিল। সে কাউকে কামড়ায় না।

খিম্পু সেন (বয়স ৪)

বাকুম-বাকুম

বাকুম-বাকুম করছে কে?
পায়রাগুলো আবার কে।
বলছে তারা আবার কী?
দেবে খাবার-টাবার কি।
তারা কী-কী খাবার খায়?
চাল গম আর সরষে চায়।
শখটা তো ওদের মন্দ নয়,
ওদের খাবার অমনি হয়।

ইলা চৌধুরী (বয়স ১২)

ছবি এ'কেছে জাহ্নবী ঘোষ (বয়স ৫)

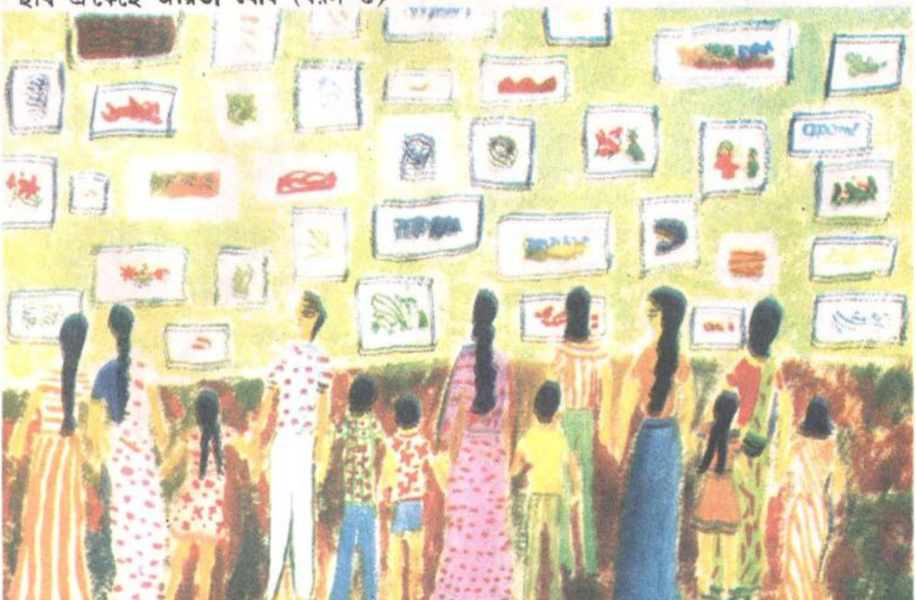

ছবি এ'কেছে দীপন বসু (বয়স ১১)

হংকংয়ের গল্প

কৃষ্ণা বসু

॥ ২ ॥

কখন যে অনেকখানি সময় খেলা দেখতে দেখতে কেটে গেল টের পেলাম না। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চললাম ওয়েভ কোভের দিকে। এটা একটা অভিনব ব্যাপার। একপাশে বিরাট ঢেউ তৈরি করার যন্ত্র বসানো আছে। তাই দিয়ে কৃত্রিম হ্রদে ঢেউ দুলে দুলে উঠছে। কোথাও মৃদু, কোথাও বিরাট ঢেউ। একদিকে বালি, বড়-বড় পাথরের টুকরো, ছোট-ছোট নুড়ি ফেলে সমুদ্রতীর তৈরি করা হয়েছে। লম্বা টানা করিডরে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে জীবজন্তু দেখার ব্যবস্থা। পাথরের দ্বীপে রোদ পোহাচ্ছে সীল মাছের দল। বেশ কিছু সামুদ্রিক পাখি রয়েছে এধার-ওধার।

একপাশে বালির ওপর পেঙ্গুইনদের জটলা। দর্শকদের গ্যালারি হল তিনতলা। একেবারে নীচের তলা জলের নীচে। সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডলফিনদের লুকোচুরি খেলা। এরা শেখানো খেলা দেখায় না, আপন মনে খেলে। শুধু আমরা ওদের দেখছি তা নয়, ওরাও কাঁচের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে অবাক হয়ে দেখছে আমাদের।

এসব সামুদ্রিক জীবকে ভীষণ যত্ন করতে হয়। যদি কোনো সী লায়নের বাচ্চা হয় মা ও বাচ্চাকে সরিয়ে ফেলতে হয় অন্যদের কাছ থেকে। অন্য সব কৌতূহলী জন্তুরা ভিড় করে বাচ্চা দেখতে এলে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে, মারা যাওয়াও আশ্চর্য নয়। বাচ্চা যতদিন না সাঁতার কাটতে শিখছে ততদিন অগভীর জলে রাখতে হয়।

একদিনে সমুদ্র-পার্কের সবটা দেখা সম্ভব নয়। তাই বলে এটল রীফ বা কী বলব, প্রবাল-দ্বীপ না দেখে তো চলে যাওয়া যায় না। আমাদের অনেকের বাড়িতেই ছোট-ছোট অ্যাকোয়ারিয়াম আছে, তাতে লাল, নীল মাছ থাকে। এটল রীফ হল পৃথিবীর সব চাইতে বড় অ্যাকোয়ারিয়াম। একটা গোল-মতো বিশাল বাড়ির মধ্যে

ডলফিনের খেলা

রাজহাঁসের জটলা

ডাবরের আমলা কেশতৈল আপনাকে অকৃত্রিম লাবণ্যে ভ'রে তোলে, তরঙ্গায়িত চিকন কালো কুন্তলে

নারীর রূপ-লাবণ্যের অর্ধেক হল—তার সুনিবিড় ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ চিকুর ।। এই সুবর্ণ সত্যের রূপদাতা —ডাবরের আমলা কেশতৈল ।। এটি লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার চুলের মূলে গিয়ে পৌঁছয়, আর আপনার চুলের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে ।। আস্তে আস্তে ঘষলে আপনার মস্তিষ্কও ঠাণ্ডা রাখে ... আপনার কেশরাশিতে নিয়ে আসে ঝলমলে ভাব আর সজীবতা। সুমিষ্ট গন্ধের আমেজের সঙ্গে সারাদিন ধরে আপনার কেশরাশি রাখে সুবিন্যস্ত।

চুলের প্রতি যত্নশীলা নারীদের কাছে ডাবরের আমলা কেশ তৈল যে খুবই প্রিয়, তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

মিষ্টি গন্ধ

ডাবর...প্রায় একশ' বছর ধরে আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সেবায়।

আমরা ঢুকে গেলাম। দর্শকের গ্যালারি ওয়েভ কোভে ছিল তিনতলা, এখানে হল চারতলা। মাঝখানে বৃহদাকার অ্যাকোয়ারিয়াম। তার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন তলা থেকে দেখতে পাওয়া যায় রকমারি মাছ।

মাছের এত রঙ হয় কে জানত! উজ্জ্বল নীল রঙের ছোট-ছোট এক ঝাঁক মাছ তরতর করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে আনাগোনা করছে। সোনালির ওপর কালো বুটিদার জমকালো আর গম্ভীর চেহারার বিরাট আকারের মাছ ড্যাব-ড্যাব করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন গিলে খাবে। মাঝারি মাছেরা কেউ স্ট্রাইপ্ড জামা গায়ে দিয়েছে, কেউ বা ফুল-কাটা। শীতকালে মরসুমি ফুলের যেমন বাহার হয় এখানে মাছেদের তেমনি রঙের বাহার। এক-একরকম মাছেদের মুখে এক-একরকম ভাব, ঠিক মানুষের মতো। কেউ রাগী-রাগী মুখ করে আছে, আবার কেউ-বা বেশ হাসিখুশি।

কাঁচের পার্টিশনের এপাশে দাঁড়িয়ে মাছেদের সঙ্গে মনে মনে খানিক গল্প করলাম। পশুপাখিদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে। কলকাতায় সুযোগ কম। আমার খাবার ঘরে দুটো চড়ুই পাখি রোজ এসে চিনির বাটি থেকে চিনি খেয়ে যায়। তাদের বলি, দেখছ তো চিনির কত দাম, কত কষ্ট করে যোগাড় করে আনা, অত খেও না। শুনে ওরা ল্যাজ একটু ওপর দিকে তুলে মাথাটা কাত করে আমাকে দেখে। তারপর কিচির-মিচির করে বলে, কী কিপ্টে রে বাবা! আর দুটো দানা চিনি মুখে করে ফুড়ুত করে উড়ে যায়। মাছেদের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ হল না, চারিদিকে লোক, যদি কেউ কিছু মনে করে! আমার একপাশে একটা চীনা পরিবার, অন্যপাশে একদল সাহেব ট্যুরিস্ট অনেক ছবি তুলে চলেছে।

অনেক হাঁটাহাঁটি করে বেজায় খিদে পেয়ে গিয়েছিল। একটু দূরে সমুদ্র-পার্কের রেস্তোরাঁ। দোতলায় কাঁচের জানালার কাছে টেবিলে বসে খাবার খেতে খেতে বাইরের দৃশ্য দেখা গেল। হংকংয়ে আমার চপ্স্টিক বা কাঠি দিয়ে খাওয়ার হাতে-খড়ি হয়েছিল।

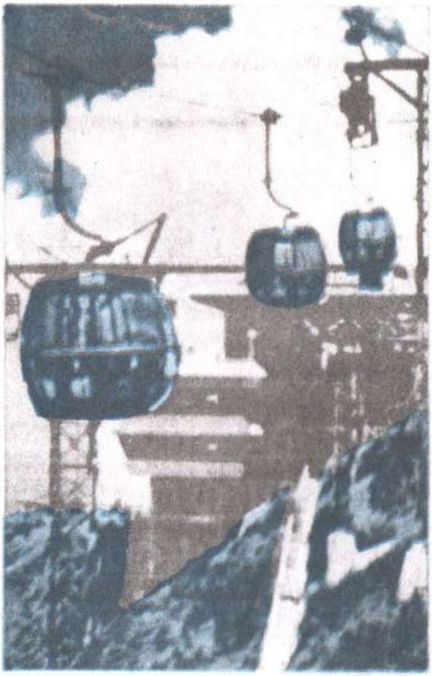

কেব্ল-কার

পরে জাপানে গিয়ে এমনভাব দেখাতাম যেন সারা জীবন চপ্স্টিক দিয়ে খেয়ে আসছি। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথের কেব্ল্-চেয়ারে চড়ে বসলাম। নীচে এসে ফুলের বাগানে ঘুরতে-ফিরতে একটা আইসক্রীম পার্লারে চোখে পড়ে যাওয়া মাত্র সকলেরই আইসক্রীম খাবার ইচ্ছা হয়ে গেল। আইসক্রীম খেয়ে সমুদ্র-পার্ককে গুডবাই বলে আমরা বাইরে এসে পড়লাম।

হংকংয়ে একটা জিনিস দেখা হল না বলে আমার মনে বেজায় দুঃখ রয়ে গেল। সে আর কিছু নয়, টাইফুন বা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। হংকংয়ে প্রায়ই টাইফুন হয়। কিছুকাল আগে টাইফুন হোপ যখন আছড়ে পড়েছিল হংকংয়ের ওপর তখন অলিদের উনত্রিশ তলার ফ্ল্যাট কেমন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল— সেই গল্প শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে আমি বলে উঠলাম, "আমরা থাকতে থাকতে একটা ছোটখাট টাইফুন হয়ে গেলে বেশ হয়, না?"

তাই শুনে আমাদের হংকংয়ের বন্ধুরা হাঁ-হাঁ করে উঠে বললেন, "শখ কম নয়!"

আয়রে তোরা, মাতবো মোরা
মন মাতানো স্বাদের নেশায়
কমলা লেবুর স্বাদগন্ধে ভরপুর সেই মজাদার পানীয়, ক্যাম্পা অরেঞ্জ* খেয়ে দেখ কেমন চন্‌মনে স্বাদ, কেমন তাজা কমলা লেবুর গন্ধ। ঐ ছবির বাচ্ছাদের মত তোমরাও তেষ্টা মিটিয়ে নাও...
এখনি, বারবার, যখন তখন।
*আর্টিফিসিয়াল ফ্লেভার
Campa
অরেঞ্জ স্বাদ
OBM/4839
Campa
Campa

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

নাজিবের কথা

বজ্র সেন

নাজিব সেবার আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছিলেন নাসির। হ্যাঁ, ইস্টবেঙ্গলের রাইট স্ট্রাইকার মহম্মদ নাজিব এবং গোলকীপার নাসিরের কথাই বলছি। গত বছর, যখন ওঁরা দুজনেই মহামেডান স্পোর্টিংয়ে ছিলেন, তখন একদিন নাজিবের কাছে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য সাক্ষাৎকার নেওয়া। নাজিব কিন্তু চকিত শট নিয়ে আমাকে ধরাশায়ী করে দিলেন—"না। ইন্টারভিউ হবে না। কী হবে ইন্টারভিউ দিয়ে? আমি তো খেলতেই পারছি না।" অনেক উপরোধ-অনুরোধ করেও কোনও লাভ হল না। কী করা যায় ভাবছি এমন সময় আমার অবস্থা দেখে নাসিরের করুণা হল। তিনিই নাজিবকে রাজি করালেন।

গত বছর নাজিবের পায়ে চোট থাকার জন্যে তিনি আশানুরূপ খেলা দূরে থাক, অনেক খেলাতে মাঠে নামতেই পারেননি। আর এবার সুস্থ থেকেও ইস্টবেঙ্গলে কতটা সুযোগ নাজিব পাবেন তা এই মুহূর্তেই বলা শক্ত। কারণ নাজিব যে-অবস্থায় ইস্ট-বেঙ্গলে সই করেছেন সে-অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ইরানের রত্নভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে। কাজেই নাজিবের ভাগ্যে কী আছে জানি না। যদি শেষ পর্যন্ত সে-রকম সুযোগ না পান তাহলে

নিঃসন্দেহে দারুণ আঘাত পাবেন নাজিব।

সত্যি, ভাগ্য নামক ব্যাপারটিকে মানতেই হয় খানিকটা—প্রতিভা যতই থাক না কেন। তা না হলে যে নাজিবকে পাবার জন্যে ১৯৭৮ সালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দু'দলই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, দলের প্রথম এগারো জনের মধ্যে তাঁর স্থান পাওয়া নিয়ে এত সংশয় দেখা দেবে কেন?

বলা বাহুল্য, ১৯৭৮ সালে কলকাতার সন্তোষ ট্রফিতে কেরলের হয়ে খেলার সময়ই জেভিয়ার পায়াস, দিনকর ও প্রেমনাথ ফিলিপের সঙ্গে নাজিবও কলকাতার তিন প্রধানের 'টার্গেট' হয়ে যান। তার পরের ঘটনা সকলেরই জানা আছে।

নাজিবের জন্ম কালিকটে। মালাবারের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হাই স্কুল থেকে সিনিয়র স্কুল-লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস করার পর নাজিব যে কেন আর লেখাপড়া করেননি, তার উত্তর ঐ যত নষ্টের গোড়া ফুটবল নামক চর্ম-গোলকটির মধ্যেই পাওয়া যাবে। বস্তুত, নাজিবদের গোটা পরিবারটাই ফুটবল-পাগল। শুধু নাজিব-পিতা আবু বকর কয়া-ই নন। বিখ্যাত ফুটবলার রহমানও সম্পর্কে নাজিবের কাকা হন। রহমান এবং আর এক জন—দেবাসি কুট্টি—নাজিবকে ফুটবলের মধ্যে টেনে আনেন। এঁদের কাছে নাজিব ঋণী। ১৯৬৮-তে নাজিবের গায়ে কালিকটের সিনিয়র ডিভিশনের দল ইয়ুথ স্পোর্টস ক্লাবের জার্সি ওঠে। এর পর ইয়াং জেমস ও ব্রিজ ক্লাবে খেলে নাজিব ১৯৭২-এ যোগ দেন প্রিমিয়ার টায়ার্সে। সুদীর্ঘ সাতটি বছর ওখানে কাটিয়ে গতবার তিনি কলকাতায় আসেন পায়াসদের মতো।

প্রিমিয়ার টায়ার্সে যাবার সময়ও নাজিব স্কুল-ছাত্রই ছিলেন এবং সে-বছর তিনি কেরলের স্কুল দলে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৭৩-এ রাজ্য জুনিয়ার দলে এবং ১৯৭৪ সাল থেকে কেরলের রাজ্য দলে। তিন বছর পরে ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন নাজিব। এর মধ্যে অবশ্য তিনি পর-পর দু-বছর কেরলের সেরা ফুটবলারের সম্মান অর্জন করেন (১৯৭৬, ১৯৭৭)।

ঢাকার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সময় থেকেই নাজিব টপ ফর্মে ছিলেন—যে-ফর্মের কিছুটা কলকাতায় সন্তোষ ট্রফিতে আমরা দেখেছি। সেবার ঢাকায় ইন্দোনেশীয় দলের বিরুদ্ধে খেলাটির কথা নাজিব ভুলতে পারবেন না কিছুতেই। ঐ খেলায় তিনি একটি গোল করেছিলেন বলেই নয়, মনের মতো করে খেলতে পেরেছিলেন বলে। হ্যাঁ, ওটাই তাঁর সেরা খেলা।

কলকাতা সম্পর্কে নাজিবের ধারণা ওঁর নিজের কথাতেই বলি—"ভেরি গুড"। আর এখানকার দর্শকদের দেখে নাজিব তাজ্জব। বললেন, কেরলে কিন্তু কোনও দলের বাঁধাধরা সাপোর্টার নেই এখানকার মতো। যেদিন যারা ভাল খেলে, সারা মাঠ তাদের উৎসাহ দেয়।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছাব্বিশ বছরের এই যুবকটি কথা বলেন খুব ধীরে। অবসর কাটে বই পড়ে কিংবা সিনেমা দেখে।

আনন্দমেলার খেলোয়াড়-পাঠকদের জন্যে নাজিবের কিছু বক্তব্য আছে। বললেন, কেউ যতই ভাল ফুটবল খেলুক না কেন, লেখাপড়ার প্রয়োজন থেকে যাচ্ছেই। কাজেই ফুটবল নিয়ে বাড়াবাড়ি করে লেখাপড়াকে অবহেলা করলে চলবে না। বরং বলা যায়, আগে লেখাপড়া, পরে ফুটবল।

ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নাজিব আশাবাদী। আর নিজের সম্পর্কে? স্পষ্ট কথায় কিছু বলতে চান না। তবে মনে হয়, যদি কোনোদিন প্রিয় খেলোয়াড় হাবিব বা ইন্দার সিংয়েরও সমকক্ষ হতে পারেন, সেদিন নাজিব উপলব্ধি করবেন, অনেকটাই করতে পেরেছেন।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

২০০০ সালের ক্রিকেট টীম

অশোক রায়

"কুড়ি বছর পরে ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট টীম কেমন হবে?" কলকাতা টেস্টে থার্ড ডে-তে ইডেনের প্রেস বক্সে গাভাসকারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা।

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে একটু অবাক হয়েছিলেন উনি। সানির দিকে একটা লিস্ট এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "এটা হয়তো কুড়ি বছর পরের ইণ্ডিয়ান টীম। এখনকার ইণ্ডিয়ান টীমের সঙ্গে যদি এদের একটা সুপার-টেস্টের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তার রেজাল্ট কী হবে?"

আমার লিস্টে চোখ বোলাতেই গাভাসকারের ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, "রেজাল্ট কী হবে বলতে পারব না, তবে এটা একটা ইণ্টারেস্টিং ম্যাচ হবে।"

আমার টীমটা কেমন ছিল এবার শোনো।

ওপেন করতে নামবে রোহন জয়বিশ্ব গাভাসকার আর বিদ্যুৎ জয়সীমা। সুনীল গাভাসকার আর এম এল জয়সীমার ছেলে। রোহন লেফট-হ্যাণ্ডার হওয়ায় জুটিটা কন্ট্রাক্টর-পঙ্কজ রায়ের মতো স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে।

ওয়ান-ডাউন আর একজন বাঁ-হাতি—প্রসাদ ওয়াদেকার, ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন অজিত ওয়াদেকারের পুত্র। টু-ডাউন টাইগার পাতৌদির ছেলে স্টাইলিস্ট সঈফ। পাঁচ নম্বরে অশোক মানকড়ের ছেলে মিহির সিলেকশন পেলেও সে নিশ্চয়ই বাবার মতো কাউণ্টি ক্যাপ পরে ব্যাট করবে না। একটা বাম্পারের লাইন থেকে সরতে গিয়ে অশোকের কাউণ্টি ক্যাপ মাথা থেকে খুলে উইকেটের ওপর পড়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা ও নিশ্চয়ই মনে রাখবে।

পাঁচজন প্রখ্যাত ব্যাটসম্যানের পরের জায়গাটা একজন দক্ষ অলরাউণ্ডারের। ফিল্ডিংয়ের কথাটা মনে রাখলে ব্রিজেশ সোলকারকে বাদ দেওয়া শক্ত। একনাথ সোলকারের তিপ্পান্নটা ক্যাচের ভারতীয় রেকর্ডটা ভাঙতে ব্রিজেশ হয়তো ওর বাবার মতোই ফরোয়ার্ড শর্ট লেগ পজিশনটাই বেছে নেবে।

উইকেট-কীপিং করার দায়িত্বটা আপাতত ফারুক ইঞ্জিনীয়ার কিংবা সৈয়দ কিরমানি পরিবারে থাকছে না। তাই বাংলার রুসি জিজিবয়ের ছেলে আরদেশরকে গ্লাভস পরতে

রোহন জয়বিশ্ব গাভাসকার। পাক-ভারত ক্রিকেট চলবার সময়ে রোহন হঠাৎ মহসীন খাঁর হাত ধরে ইডেন-মাঠে নেমে পড়েছিল, মনে আছে?

দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ভারতের পেস অ্যাটাক কেমন হবে সেটা নির্ভর করছে আসিফ ইস্‌মাইল আর বাংলার অসাধারণ সুইং বোলার সুব্রত গুহর ছেলে জয়দীপের ওপর। বোম্বাইয়ের আব্দুল ইস্‌মাইল রঞ্জি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক সহ ১৯৮টি উইকেট পেয়েও টেস্টে ডাক পাননি। সুব্রত গুহ টেস্টে ডাক পেয়েও তেমনভাবে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। কপিল-ঘাউড়ি কম্বিনেশনেও যা পারেনি, তা হয়তো ওদের জুটি পারবে।

তবে পেস বোলিং যেমনই হোক ভারতের স্পিনের ট্রাডিশন কিন্তু বজায় থাকবেই। বিস্ময়-বোলার চন্দ্রশেখরের ছেলে নীতিন বাবাকেও হয়তো ছাপিয়ে যাবে। বিষেণ সিং বেদীর ছেলে গাভাসিন্দর আর দিলীপ দোশির ছেলে নয়নের মধ্যে স্লো লেফ্‌ট আর্ম স্পিনার হিসেবে কে টীমে আসবে তাই নিয়ে জোর ফাইট হবে।

যে দুটো জিনিস বাদ থেকে গেছে. তা হল একজন ক্যাপ্টেন এবং একজন টুয়েলভ্‌থ ম্যান সিলেকশনের ব্যাপারে।

ভারতের পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক টেস্টে ক্যাপ্টেন ছিলেন পাতৌদি। ওয়াদেকার আবার ক্যাপ্টেন হিসেবে লাকি। সুতরাং সঈফ এবং প্রসাদের মধ্যে কে ক্যাপ্টেন হবে, তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। তবে নির্বাচক-কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্ট যেভাবে 'কাস্টিং ভোট' প্রয়োগ করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেছিলেন এক্ষেত্রে ও'র ছেলে অমর মার্চেন্ট হয়তো সেইভাবেই এ বিতর্কে ইতি টানবেন। ক্রিকেট-বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে পারলে উনিশটি টেস্টের অপরাজিত অধিনায়ক গাভাসকারের ছেলে রোহনের ক্যাপ্টেন হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সুপার-টেস্টের ব্যবস্থা যদি ইডেনে হয় তাহলে দর্শকরা হয়তো সবচেয়ে খুশি হবে বাংলার বেস্ট ফিল্ডার অলক ভট্টাচার্যের ছেলে অরিন্দমকে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে দেখলে।

সুপার টেস্টটা যদি সত্যিই ইডেনে হয় তাহলে রেজাল্ট কী হবে বলো তো?

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

জেলের রূপান্তর বা নবনালন্দা

তোমরা তো অনেকেই এখন স্কুলে পড়ছ। স্কুল শেষ হলে একসময় কলেজ, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিন আসবে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই তোমাদের এখন বলবো।

বিশ্ববিদ্যালয় বলতেই প্রথমে মনে আসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। জান তো আলিপুর জেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরিয়ে নিয়ে যাবার কাজ গত ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হয়ে গেছে। তোমরা তো জানই এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ভয়ানক ভয়ানক সব হট্টগোলের জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়ে আসছে। যেমন কলেজ স্ট্রীট, রসা রোড, বি. টি. রোড, রাজাবাজার.........। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ২০ একর জমিতে ছ'হাজার মত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। অন্যদিকে আলিপুর জেলের ১২৫ একর জমিতে তিন হাজার মাত্র বন্দী থাকে। এখন প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগটাই আলিপুরের জেলে সরে যাচ্ছে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় পুরোটাই উঠে আসবে। তোমরা যখন নতুন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে তখন সংলগ্ন লাইব্রেরী, দেড়হাজার সিটের প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কক্ষ, কাফেটেরিয়া, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, টেবিল টেনিস সব পাবে। আর পাবে খোলামেলা, সবুজ, শান্ত পরিবেশের এক ক্যাম্পাস বা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। অর্থাৎ পড়াশোনার পক্ষে যে পরিবেশ দরকার। কিংবা বলতে পার প্রাচীন নালন্দার মত নতুন এক জায়গা—নবনালন্দা।

কলকাতা বদলাচ্ছে ধীরে ধীরে। অনেক দিকে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। কলকাতার ভাল মানে আমাদের সকলের ভাল।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা ১৭ থেকে প্রচারিত)

হরতনোর প্রত্যাবর্তন

অলোক দাশগুপ্ত

বুড়ো বয়সে ভেলাক দেখালেন রুডি হরতনো। দ্বিতীয় বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনের ফাইনালে স্ট্রেট সেটে হারালেন ন'বছরের ছোট লিয়েম সুই কিংকে।

ব্যাডমিণ্টন-বোদ্ধারা একবাক্যে স্বীকার করেন, রুডিই ব্যাডমিণ্টনের সর্বকালের সেরা শিল্পী। কিন্তু এ'বারই সর্বপ্রথম সরকারি বিশ্ব-খেতাব তাঁর ভাগ্যে জুটল, কারণ রুডি যখন চুটিয়ে ব্যাডমিণ্টন কোর্টে রাজত্ব করেছেন, তখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হয়নি। অল-ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নকেই বেসরকারি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন বলে ধরে নেওয়া হত।

আজ থেকে বারো বছর আগে উনিশ বছরের রুডি ওয়েম্বলিতে প্রথম খেতাব জেতেন। নয় বছর ধরে বিশ্ব-ব্যাডমিণ্টনে তাঁর একচেটিয়া প্রাধান্যের সেই শুরু। পরপর সাতবার এবং মোট আটবার অল-ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করার পর হরতনো হঠাৎ মনস্থির করেন ত্রিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পড়াশুনো এবং রুডি এণ্টারপ্রাইজের কাজকর্মে তাঁকে আরও সময় দিতে হবে। আর তাই দারুণ ফর্মে থাকতে-থাকতেই ব্যাডমিন্টন কোর্টকে বিদায় জানিয়েছিলেন এই অসাধারণ ইন্দোনেশীয় খেলোয়াড়।

কিন্তু দেশের সম্মান রক্ষায় র‍্যাকেট হাতে রুডিকে আবার ফিরে আসতে হল। সম্প্রতি কয়েকটি টুর্নামেণ্টে চীনাদের হাতে ইন্দোনেশীয় খেলোয়াড়দের হার এবং অল-ইংল্যাণ্ড ফাইনালে প্রকাশ পাড়ুকোনের কাছে কিংয়ের পরাজয় ব্যাডমিণ্টন-পাগল ইন্দোনেশিয়ায় দারুণ আলোড়ন তুলেছিল। হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য ডাক পড়েছিল রুডি হরতনোর।

বত্রিশ বছর বয়সকে বলা যায় একজন খেলোয়াড়ের সায়াহ্নকাল। বিশেষ করে ব্যাডমিন্টনের মতো খেলায়, যে-খেলা ক্রমশ স্পীড, পাওয়ার এবং স্ট্যামিনার উপরে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। রুডি জানতেন, ন'বছরের ছোট লিয়েমের বিরুদ্ধে জিততে হলে স্ট্রেট সেটে জিততে হবে, কারণ খেলা যত বেশিক্ষণ চলবে, তাঁর নিজের স্ট্যামিনায় তত টান পড়বে।

হরতনো (অভিজ্ঞতার সাফল্য)

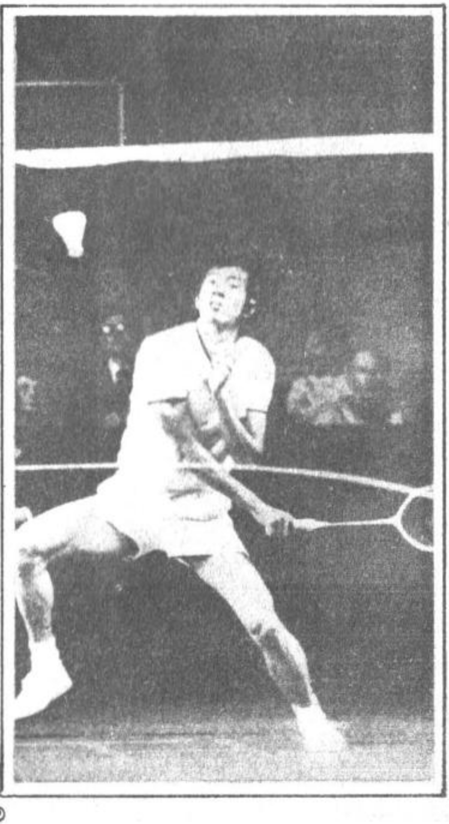

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্‌টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন :

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

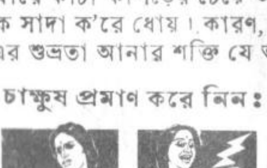

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে
শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.35-1810 BG

কিং তাঁর স্বাভাবিক আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হরতনো আলাদা জাতের খেলোয়াড়। নিখুঁত প্লেসিং এবং ড্রপ শটের মাধ্যমে কিংকে উনি অনবরত কোর্টের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছোটা-ছুটি করিয়েছেন। ছয় ফুট লম্বা রুডি যখন চকিতে লাফিয়ে উঠে স্ম্যাশ করেন, তখন পালকের বলটি নেট ঘেঁষে বিপক্ষ কোর্টে এমনভাবে আছড়ে পড়ে যে, প্রতিপক্ষ তা ঠিকমতো ফেরত পাঠাতে পারেন না।

অসাধারণ দক্ষতা এবং ক্রীড়া-শৈলীর পরিচয় দিয়ে ১৫-৯, ১৫-৯ পয়েন্টে দ্বিতীয় বাছাই কিংকে হারালেন তৃতীয় বাছাই হরতনো। গুরুর কাছে শিষ্যের হার (একসময়ে কিং হরতনোর কাছে ব্যাডমিন্টনের পাঠ নিয়েছেন) মোটেই অগৌরবের নয়। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে; সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রতিযোগিতার ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে, কিংয়ের ফর্ম পড়তির দিকে।

এ'বারের চ্যাম্পিয়নশিপকে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ না বলে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আখ্যা দিলে হয়তো খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। ইন্দোনেশীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো বিভাগে শেষ চারজনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন, এবং একমাত্র মহিলাদের ডাবলস ছাড়া সমস্ত খেতাব জিতেছে ইন্দোনেশিয়া।

মহিলাদের সিঙ্গলসে জয়ী হয়েছেন পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা বীরাবতী, অনায়াসে স্বদেশীয় ইভানাকে হারিয়ে। পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস জিতেছেন যথাক্রমে আদে চন্দ্র এবং ক্রিশ্চিয়ান ও ইমেলদা এবং ক্রিশ্চিয়ান জুড়ি। কেবলমাত্র মহিলাদের ডাবলসে ইংল্যান্ডের মাইক ট্রেজেট এবং নোরা পেরি ১৫-১২, ১৫-৩ পয়েন্টে হারিয়েছেন বীরাবতী ও ইমেলদাকে।

জাকার্তার গরম এবং আর্দ্রতার সঙ্গে ইউরোপীয় খেলোয়াড়রা সম্ভবত তেমন খাপ খাইয়ে উঠতে পারেননি। স্বেন প্রি হেরে গেছেন প্রথম ম্যাচে, গতবারের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ফ্লেমিং ডেলফস দ্বিতীয় ম্যাচে, চতুর্থ বাছাই মর্টন ফ্রস্ট হ্যানসেন কোয়ারটার ফাইনালে এবং মেয়েদের শীর্ষ-বাছাই লেনে কোপেন সেমিফাইনালে।

পুরুষদের একনম্বর বাছাই প্রকাশ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
মন-মাতানো উপন্যাস
রুকু-সুকু
আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে

কিং (গুরুর কাছে পরাজয়)

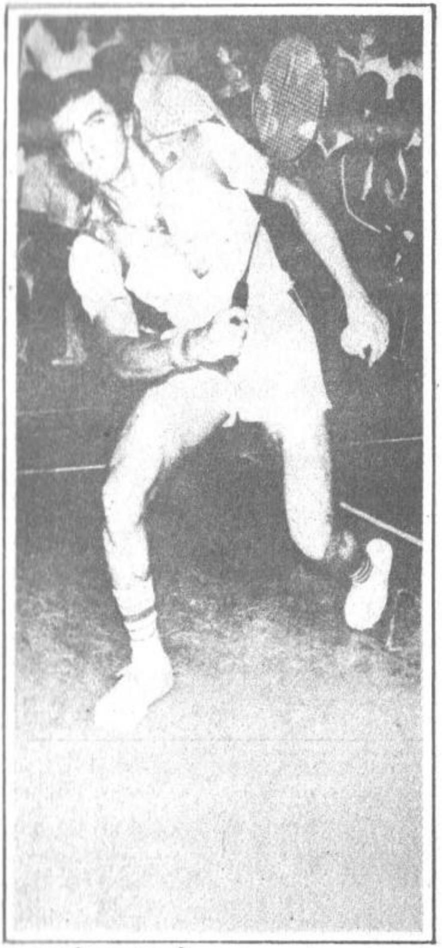

প্রকাশ (পারলেন না)

পাড়ুকোনকে ঘিরে ভারতীয়দের অনেক আশা ছিল। কিন্তু প্রকাশ সেই আশা পূরণ করতে পারেননি, কোয়ারটার ফাইনালে হেরে গেছেন অবাছাই ইন্দোনেশীয় হাদিয়ান্তোর কাছে, যে-হাদিয়ান্তোকে ওয়েম্বলিতে প্রকাশ ১৫—০, ১৫—১০ পয়েণ্টে হারিয়েছিলেন।

ভারতীয় দল রওনা হওয়ার আগেই শুনেছিলাম, প্রকাশ তেমন ভাল ফর্মে নেই। জাকর্তা পৌঁছনোর আগে ভারতীয় দল মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেয়। মালয়েশিয়ার উঠতি খেলোয়াড় মিসবুন সিদেকের কাছে প্রকাশের পরাজয় ছিল অপ্রত্যাশিত।

তবু বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা প্রকাশ বেশ ভালভাবেই শুরু করেছিলেন। প্রথম দুটি ম্যাচ সহজেই জিতেছেন, কিন্তু হাদিয়ান্তোর বিরুদ্ধে নিজের খেলা খেলতে পারেননি। প্রকাশ বলেছেন, র‍্যালি চলার সময় ইন্দোনেশীয় সমর্থকদের অনবরত চ্যাঁচামেচি তাঁর মনঃসংযোগ নষ্ট করেছে। ইন্দোনেশীয়রা স্বদেশীয় খেলোয়াড়কে সমর্থন করবে এটাই স্বাভাবিক। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রকাশ ভাল খেলবেন এটাই সবাই আশা করেন। তবে প্রকাশের পরাজয়ে 'প্রকাশপ্রেমীদের' মুষড়ে পড়ার কিছু নেই। আজ একজন জিতবে, কাল সে হারবে—আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই-ই তো নিয়ম।

অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র সৈয়দ মোদি তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত পৌঁছেছেন। পার্থ গাঙ্গুলি এবং আমি ঘিয়া হেরেছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে; বিক্রম সিং প্রথম রাউন্ডেই।

সবশেষে ব্যাডমিণ্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার কর্তাদের কাছে একটাই অনুরোধ, ভবিষ্যতে ব্যাডমিন্টন কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন যেন বাঙ্গালোরের বদলে পাতিয়ালায় হয়। বাঙ্গালোরে ক্যাম্প হলে প্রকাশ হয়তো তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকতে পারেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে যতটা মনঃসংযোগ দরকার, নিজের অজান্তেই হয়তো তাতে ঘাটতি দেখা দেয়। পাতিয়ালায় অন্তত তেমন কিছু হবার আশঙ্কা নেই।

পুরস্কার

দশ বছরের কম যাদের বয়স, তাদের উপযোগী উল্লেখযোগ্য বইয়ের লেখক ও চিত্রকরকে শিশুসাহিত্য সংসদ থেকে একটি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৩৮৬ সনের জন্য সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 'মজার কবিতা'র লেখক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এবং 'ছুট্টমালার দেশে'র চিত্রকর শ্রীদেবাশিস দেবকে। পাক্ষিক আনন্দমেলার প্রতি সংখ্যাতেই দেবাশিস দেবের ছবি থাকে। তোমরা সেই ছবি দেখে খুশি হও। এবারে তাঁর পুরস্কৃত হবার খবর শুনে তোমরা আরও খুশি, তাই না?

পাখির চোখে দেখা

কুন্তক

'সাবধান সবাই, সাবধান। আমি কিন্তু নায়ে ভরা দিয়ে ঢুকছি' বলতে বলতে ঘরে এল নন্তু, আর এসেই আওড়াতে শুরু করল:

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।

কী রকম হল কাকু?

কী হল এটা?

ওই যে তোমার নায়ে ভরা দিয়ে? নায়ের অলংকার হল না বেশ?

তা হল। কিন্তু কী ভাবে হল বল তো?

এই যে দুবার 'নহে' বললাম।

ব্যস? নহে বললেই হবে? তাহলে তো 'টুম্পি নন্তু নহে' বললেই চুকে যায়। ব্যাপারটা একটু বুঝে নে আগে। ও কি চাঁদ, না কাস্তে? এইভাবে বললে কথাটায় রইল সন্দেহ, হল সন্দেহ অলংকার। চাঁদের কথাই যদি বলতে চাই আমি, তো কথাটা এভাবেও বলা যায়: কাস্তে নয়, ওটা চাঁদ। তখন নিশ্চয় করে বলা হল সত্যটা, বলতে পারিস নিশ্চয় অলংকার। কিন্তু এর মধ্যে মূল কথাটা তো এই যে, চাঁদের সঙ্গে কাস্তের একটা মিল দেখতে পাচ্ছেন কবি? সেই মিলটা না থাকলে তো সবটাই মাটি।

টুম্পি বলল: তাহলে দাদার ওই লাইনকটা তো হয়ইনি কিছু।

কেন হয়নি?

ওর মধ্যেই বা মিল কোথায়? সাগর-গর্জনের সঙ্গে কেউ বনমর্মরকে গুলিয়ে ফেলে নাকি? দুটো কি একরকম নাকি? ঢেউয়ের ফেনার সঙ্গে কুঁদফুলে ভরা বাগানকে কেউ মেলায় নাকি? কবি বলে কি অতই মাথাখারাপ?

বলেছিস ভাল। চট করে এ দুটোকে মিলিয়ে ফেলবার কথা নয়। একটার মতো তো সত্যিই নয় আরেকটা। কিন্তু একটা কথা বলি তোকে। মনে আছে সেই আমাদের

পুরীতে বেড়ানো?

পুরী? মনে থাকবে না?

মনে আছে? সমুদ্রটা চোখে পড়ার কিছু আগেই শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল দূর থেকে? আর তুই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছিলি, ও কিসের আওয়াজ?

হ্যাঁ। কী সুন্দর যে লেগেছিল।

কিন্তু অনেক নরম লেগেছিল না দূর থেকে? আর তারপর কাছে আসতেই কী গর্জন!

আরেকবার গেলে হয় না পুরীতে?

তা হয়। কিন্তু এইবার ভাব নন্তুর ওই লাইনকটাকে। যে কবিতা থেকে বলছে নন্তু, সেখানে একটা পাখির কথা আছে না? আছে না, ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর? ছবিগুলি তো সব পাখির চোখে দেখা? অনেক দূরের থেকে সেই পাখির দেখায় শোনায় সাগরের সফেন ঢেউকেও মনে হতে পারত কুন্দফুলের উপবন, তুমুল গর্জনকেও মনে হতে পারত মুখরিত বনমর্মর। না? কিন্তু সেটা যে নয় সেকথাই বলা হল এখানে। কী ভাবছেন, নন্তুবাবু?

ভাবছি, যদি বলি, 'এ কি মুখরিত বনমর্মরগুঞ্জিত? না কি অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে? এ কি উপবন কুন্দকুসুম-রঞ্জিত? না কি ফেনদল কলকল্লোলে দুলিছে?' তাহলেই তো নিশ্চয়টা সন্দেহ অলংকার হয়ে যাবে?

তা যাবে, তবে সন্দেহ হয় যে, লাইনটাও ডুবে যাবে। তাই না?

(ক্রমশ)

ছোটদের যত সেরা বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে বড়োদেরই জনপ্রিয় লেখক তা নয়, ছোটরাও তাঁর কিশোর-সাহিত্যের দারুণ ভক্ত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় ছোটদের লেখা নিয়ে যেমন বেরিয়েছে শরদিন্দু অম্নিবাসের চতুর্থ খণ্ড, তেমনই আলাদাভাবে পাওয়া যায় দুটি অ্যাডভেনচার কাহিনীর এক অনবদ্য সংকলন, সে-বইটির নাম 'ভূমিকম্পের পটভূমি'। একটি কাহিনী এক আশ্চর্য দ্বীপের পটভূমিকায়, সেই দ্বীপে থাকে একটিমাত্র ছোট্ট মেয়ে তিতি আর তার এক ক্যাঙারু-বন্ধু, খিট্টা। আরেকটি উপাখ্যান পাঁচশো বছর আগের এক যুবরাজ-যুবরানীকে নিয়ে, বহু জন্ম পরে যাদের আবার মিলন ঘটল।

অন্নদাশঙ্কর রায় এমন বহু ছড়া লিখেছেন যা লোকের মুখে-মুখে ফেরে। যেমন, 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে/ খুকুর 'পরে রাগ করো/ তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো'—আধুনিক কালের এই ছড়াটি অনেকেরই কণ্ঠস্থ। এমন সার্থক ছড়া এ-যুগে একমাত্র অন্নদাশংকর রায়ই লিখতে পেরেছেন। লোকের মুখে-মুখে ফেরার মতোই তাঁর আরো অনেক ছড়া রয়েছে। সেই-সব ছড়া নিয়েই বেরিয়েছে একটি নতুন সংকলন—'হৈ রে বাবুই হৈ।' প্রত্যেকটি ছড়া যেমন মন-মাতানো, তেমনি প্রতিটি ছড়ার সঙ্গে রয়েছে দারুণ-দারুণ মন-ভোলানো রঙিন ছবি, অহিভূষণ মালিকের আঁকা।

পূর্ণেন্দু পত্রীর কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫ কলকাতার রাজ-কাহিনী ৫ **মৌমাছির** রাজ্যের রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **পাপু (সুব্রত সরকার)-র** পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **সংকর্ষণ রায়ের** গভীর গহন ৭ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৫ মজার এক্সপেরিমেণ্ট ৫ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৫ রসায়নের ভেল্‌কি ৪ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশু-সাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ বনবিবির বনে ৬ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদু-ঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৭ স্টপার ১০ কোনি ৭ ক্রিকেটের আইন কানুন ১০ খেলার যুদ্ধ ১২ **বিমল করের** ওআওার মামা ৭ কাপালিকরা এখনও আছে ৮ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো দ্বীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** সাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ গোঁসাইবাগানের ভূত ৮ **গৌরকিশোর ঘোষের** দুষ্টু দুপুর ৪

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪-৪৩৬২

কম-বেশি

প্রসাদ

চামেলি বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "এডিনবরা কলকাতা থেকে কত দূরে, বাবা?"

বাবা বললেন, "বাড়িতে মানচিত্রের বই আছে, তাতে এসব দেওয়া আছে। খুঁজে বের করো।"

তোমরা বের করো দেখি : (উত্তরগুলো ইংরেজিতে লিখতে হবে)

Q. How far is Edinburgh from Calcutta?

Q. How far is Paris from Calcutta?

এর পরের প্রশ্নের উত্তরটা কীভাবে লিখতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ উত্তরের বাক্যটা আমি লিখে দিচ্ছি, তোমরা খালি বাক্যের ফাঁক দুটো ভর্তি করে দেবে।

Q. Which is farther from Calcutta, Edinburgh or Paris?

Ans. ....is farther from Calcutta than .... is.

এর মধ্যেই তোমরা কেউ কেউ একটু গুঞ্জন তুলতে আরম্ভ করেছ, আমি শুনতে পাচ্ছি : "দূরত্ব মানে কী? জাহাজে গেলে একরকম দূরত্ব, এরোপ্লেনে গেলে আরেক রকম দূরত্ব, আবার দুটো শহরের মধ্যে সোজাসুজি লাইন টানলে আরেক রকম দূরত্ব। কোনটা লিখব?" তিনটেই লেখো :

Q.1. How far is Paris from Calcutta by air?

Q.2. How far is Paris from Calcutta by the surface route?

Q.3. How far is Paris from Calcutta as the crow flies?

তিনটের দূরত্ব পেলে। এখন এই প্রশ্নটা করা যায়।

Q.4. Which is the longest distance?

Ans. The distance by the surface route is the longest.

আরেকটা প্রশ্নও করা যায়। উত্তর তোমরা লেখো :

Q.5. Which is the shortest distance?

Ans.

এ-সব হল তুলনার ব্যাপার, কিংবা তফাত থাকা না-থাকার ব্যাপার :

Chameli and Kumkum are in the same class at school.

Kumkum is the same age as Chameli.

They share the same desk.

Chameli talks as much as Kumkum.

Kumkum can run as fast as Chameli.

Chameli can jump as high as Kumkum.

আর, যদি প্রায় একরকম হয় :

Chameli's father is almost the same age as Kumkum's.

Kumkum's brother Kamal is about the same age as Chambal.

Kamal is nearly as tall as Chambal.

Kamal loves football nearly as much as Chambal loves cricket.

তফাত থাকলে :

Kajal is taller than Kumkum.

Rajasi is shorter than Kumkum.

Kajal is the tallest of the three.

এবারে তোমরা নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও দেখি, গোটা গোটা ইংরেজি বাক্য লিখে :

1. Which is the tallest building in the world?

2. Which is the largest land animal?

3. Is Calcutta as hot in summer as Durgapur?

4. Is Mt. Godwin Austin higher than Mt. Everest?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

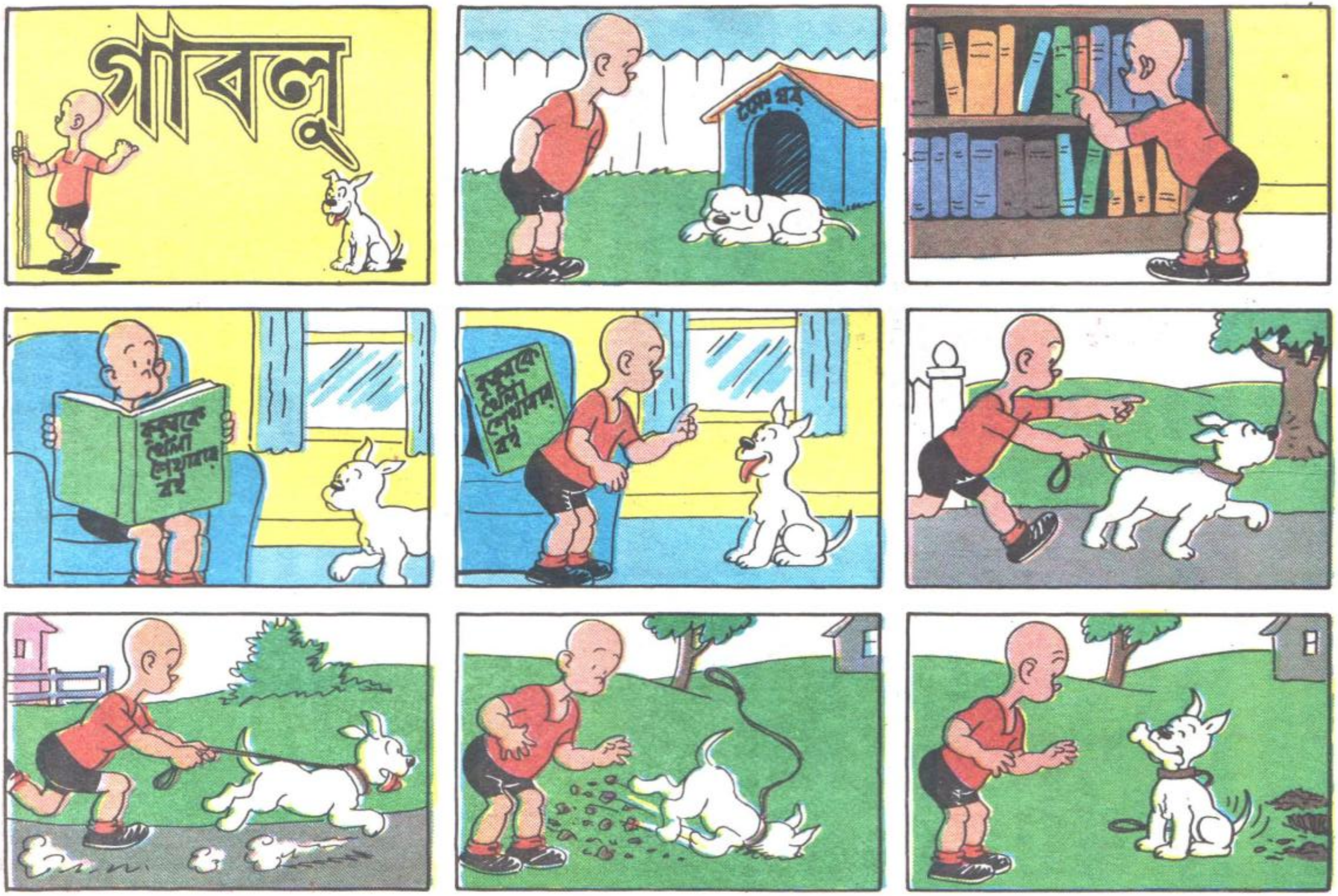
গাবলু
কুকুরকে খেলা শেখাবার বই

যোধপুর পার্ক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

সাধনা মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এলাকা যোধপুর পার্ক। পরিচ্ছন্ন রাস্তার দু-দিকে সুন্দর সুন্দর বাড়ির সারি। এখানেই যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল। গভর্নমেণ্ট স্পনসর্ড এই স্কুলটি চালু হয় ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি। যোধপুর পার্ক সোসাইটির দেওয়া জমির ওপর তৈরি হয়েছে স্কুলের নিজস্ব ভবন ও খেলার মাঠ।

এই স্কুল থেকে প্রায় প্রতি বছর সাত-আটটি ছাত্র ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে থাকে। সায়ান্স ট্যালেণ্ট স্কলারশিপও বেশ কিছু ছেলে পেয়েছে। সাধারণত সব ছাত্রই মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে। গত বছর ষাট জন ছেলের মধ্যে ৩৬ জন প্রথম বিভাগ,

২২ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং মাত্র একজন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। 'পাস' পেয়েছে একজন।

প্রধান শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্ররঞ্জন ভট্টাচার্যের বিষয় ইংরেজি ও গণিত। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ৩৬ বছরের। গোড়া থেকেই এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে আছেন।

"পরীক্ষার প্রশ্নের ভাল উত্তর কীভাবে লিখতে হবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভট্টাচার্য বললেন, "ভাল উত্তরের প্রথম শর্ত হচ্ছে—উত্তর হবে নিখুঁত, নির্ভুল এবং সুসংবদ্ধ। লিখিত পরীক্ষার সবচেয়ে বড় জিনিসই হচ্ছে প্রাঞ্জলতা। সেইজন্যে প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে সৌন্দর্য ও সাবলীলতা অবশ্যই থাকা চাই। প্রশ্নোত্তরে জ্ঞানের পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে হবে, তবে জ্ঞানের পরিধির তো সীমা নেই। পরীক্ষায় সাধারণ ছেলের পক্ষে ফলাও করে জ্ঞানের পরিচয় দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। তার উচিত শুধু না-জানা ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়া। অভ্যাসের অভাবে ছাত্ররা ছোট ছোট ভুল করে বসে। কাজেই অনবরত অভ্যাস ছাড়া উপায় নেই। ভাল ছাত্ররা কঠিন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করবে, যেটা সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে সাধারণ ছাত্রই হোক আর ভাল ছাত্রই হোক, পরীক্ষার ফল ভাল করার জন্যে প্রচুর অভ্যাসের দরকার।"

"ইংরেজি ও বাংলা কীভাবে চর্চা করলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়?"

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভট্টাচার্য বললেন, "ইংরেজিতে প্রশ্নপত্রের যে ধরন তাতে বাক্য-গঠনের রীতি ভালভাবে শিখতে হবে। সিলেবাসে থাকুক বা না থাকুক অ্যানালিসিস করা শিখতে হবে। বাক্যগঠন করতে না পারা সবচেয়ে বড় সমস্যা। বাক্য ঠিকমতো গঠন করতে পারলেই নম্বর বেশি পাওয়া যায়। বেশি মুখস্থ করার দরকার হয় না। পাঠ্যবই ভাল করে পড়লে ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারা যায়, অনেক পরিশ্রম বেঁচে যায়।

"বাংলাতেও লেখার অভ্যাস বাড়াতে হবে। এখানেও সেই একই সমস্যা—বাক্য গঠনের। ছেলেরা পাঠ্য পুস্তক নিজেরা ভাল করে পড়ে নিজেরাই উত্তর লিখতে চেষ্টা করবে। সহায়ক পুস্তকের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। বানান ভুল ও গুরুচণ্ডালি দোষ এড়াতে হবে।"

"অঙ্ক কী ভাবে কষলে ভাল হয়?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক বললেন, "অঙ্কে মৌলিক নিয়ম-কানুন-গুলো ভাল করে জানা দরকার। অঙ্ক কষার কৌশল ও নীতি ভাল করে শিখতে হবে। ছকে বাঁধা প্রশ্নের বাইরের প্রশ্ন দেখে ভয়

পেলে চলবে না। প্রতিটি নিয়মকে বুঝে শিখতে হবে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুখস্থ করলে চলবে না।"

বিজ্ঞান প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত "বিজ্ঞানে বেশির ভাগই ছোট ছোট অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন থাকে। সাধারণত সেগুলির উত্তর চার-পাঁচ লাইনের বেশি হয় না। বুঝে পড়তে হবে, জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হবে, শুধু মুখস্থ করলেই চলবে না। জানা জিনিস ভালভাবে সাজিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রয়োগ-কৌশলটুকু ভালভাবে জানলে পরীক্ষার ফল ভাল হবে।"

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক বললেন, "ম্যাপ দেখে ভূগোল পড়া উচিত। কারণ, ম্যাপ ছাড়া কোনো দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না। ইতিহাসে প্রতি যুগের সামাজিক ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে একটু বুঝে পড়লে খুব সুবিধে হয়। মূল প্রশ্নে যথাযথভাবে পৌঁছবার কলাকৌশলটুকু শিখতে হবে সব বিষয়েই, তবেই পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যাবে। কর্মশিক্ষায় নিজের হাতে কাজ করলে ও ডায়েরিতে নোট রাখলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়। কর্মশিক্ষার নম্বর মৌখিক প্রশ্নের ওপরই নির্ভর করছে। কাজেই ঠিক উত্তর দিতে হবে। শারীরশিক্ষায় যে কর্মসূচী স্কুল গ্রহণ করেছে, সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে।"

আনন্দমেলা সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক বললেন, "এটি শিশুদের একটি উপভোগ্য পত্রিকা।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

যোধপুর বয়েজ স্কুলের ছাত্র কৌশিক ভট্টাচার্য শতকরা ৭৯ ভাগ নম্বর পেয়ে নাইন থেকে টেনে উঠেছে। দুটো সেকশান মিলিয়ে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। বয়স পনেরো বছর। থাকে সন্তোষপুরে। এই স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ছে। প্রতি বছরই ফার্স্ট হয়। কৌশিকের বাবা সরকারি চাকরি করেন।

স্কুলের দিন সকালে আড়াই ঘণ্টা, রাত্তিরে তিন ঘণ্টা পড়ে কৌশিক। ছুটির দিন দুপুরে আরও দু ঘণ্টা বেশি পড়া হয়। পড়ার চেয়ে কৌশিক লেখে বেশি। বাবা-মা দুজনেই কৌশিককে পড়ান। বাবা কিছু-কিছু বিষয় দেখিয়ে দেন, মা কিছু-কিছু বিষয় দেখেন। প্রশ্নের উত্তর লিখে কৌশিক মাঝে মাঝে স্কুলের শিক্ষকদের দিয়েও দেখিয়ে নেয়। বাড়িতে পড়ানোর জন্যে কৌশিকের কোনো মাস্টারমশাই নেই। বাবার বিষয় পদার্থবিদ্যা, মায়ের বাংলা। বড় হয়ে কৌশিকের স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে পড়ার ইচ্ছে। বাবা-মায়ের ইচ্ছে, ছেলে যেন এঞ্জিনীয়ারিং পড়ে।

বোর্ডের পরীক্ষায় কৌশিক শতকরা ৮৫ ভাগ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করছে। শরীর ভাল না থাকার জন্যে এবারে নাকি ভাল পরীক্ষা দিতে পারেনি। অন্যান্য বার পরীক্ষায় শতকরা ৮২ ভাগ নম্বর পায়।

কৌশিক টেবিল টেনিস খেলতে ও সাঁতার কাটতে ভালবাসে।

পাক্ষিক আনন্দমেলা পড়ে কৌশিক বিভিন্ন স্কুলের ফার্স্ট বয় ও ফার্স্ট গার্লের প্রস্তুতির খবর জানতে পারে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের বক্তব্য জেনেও কৌশিক উপকৃত হয়। আনন্দমেলায় প্রকাশিত সমরেশ বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস "বন্ধ ঘরের আওয়াজ" ওর খুব ভাল লেগেছে।

ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঘা

ফের বিছানায় উঠেছিস? নাম বলছি!
বাইরে গিয়ে খেলাধুলো কর!
দেখি তো কুতুয়াটা কী করছে!
কুতুয়াটাকে দেখেছিস?
হারুদের বাড়িতে দেখলাম!
কুতুয়া কোথায় রে?
ভিতরে!

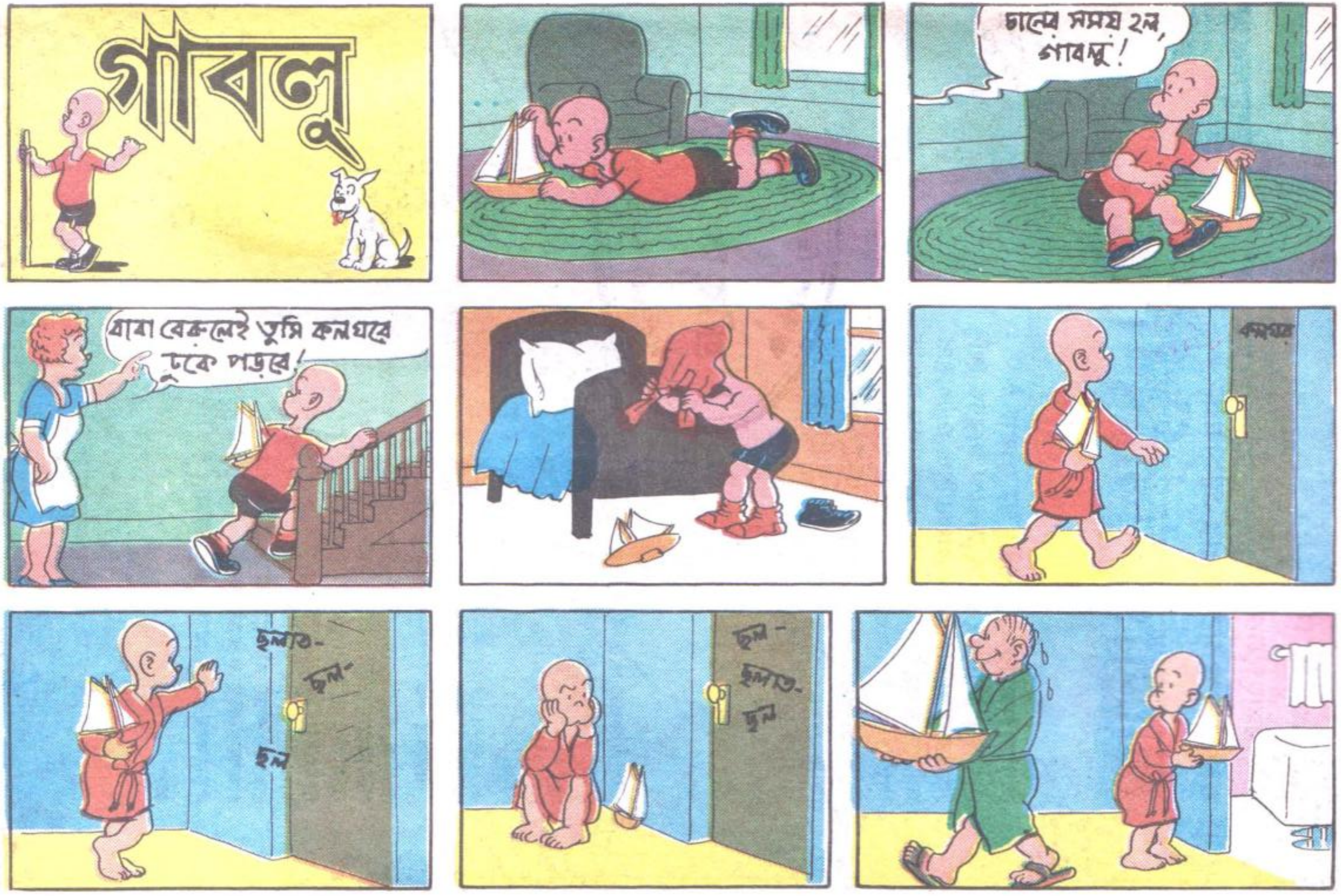
গাবলু
চানের সময় হল, গাবলু!
বাবা বেরুলেই তুমি কলঘরে ঢুকে পড়বে!
কলঘর
ছলাত- ছল- ছল
ছল- ছলাত- ছল

প্রকাশিত হলো
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

আলোর ফুলকি

দেড়শো বছরের ধারাবাহিকতায় সেকাল ও একালের প্রবীণ ও নবীন দেড়শো জনেরও বেশি লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অভিনব সংকলন। বারোজন প্রখ্যাত শিল্পীর বারোটি বহুরঙা আর্ট প্লেট সম্বলিত। বিশিষ্ট শিল্পীদের অলংকরণে প্রতিটি রচনা চিত্রিত। পনেরো টাকায় অফসেটে দ্বি-বর্ণে ছাপা পাঁচশো চল্লিশ পৃষ্ঠার বই।

★ যাঁরা কলকাতার বিতরণ শাখা (২৩, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-১, পঞ্চমতল), এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলা তথ্য অফিসে গ্রাহক হয়েছেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে গ্রাহক কুপন দেখে ১০ই জুন থেকে (বেলা ১২টা থেকে ৪টে পর্যন্ত) বই দেওয়া হচ্ছে।

★ অন্যান্য জেলায় যাঁরা গ্রাহক হয়েছেন, তাঁরা সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসে গ্রাহক কুপন দেখিয়ে আগামী ২০শে জুন থেকে বই সংগ্রহ করতে পারবেন।

★ যাঁরা কলকাতার বিতরণ শাখায় মানিঅর্ডারে গ্রাহক-মূল্য পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে আলাদা চিঠি পাঠানো হয়েছে। মানিঅর্ডারের রসিদ ও উক্ত চিঠি দেখে বিতরণ শাখায় ১০ই জুন থেকে বই দেওয়া হচ্ছে, তবে আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে বই সংগ্রহ করা না হলে ভি.পি.পি. করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কাছে বই পাঠানো হবে। সেক্ষেত্রে ভি.পি.পি. খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

নতুন করে আর গ্রাহক করা হচ্ছে না।

[আই. সি. এ./এজি. /৮০]

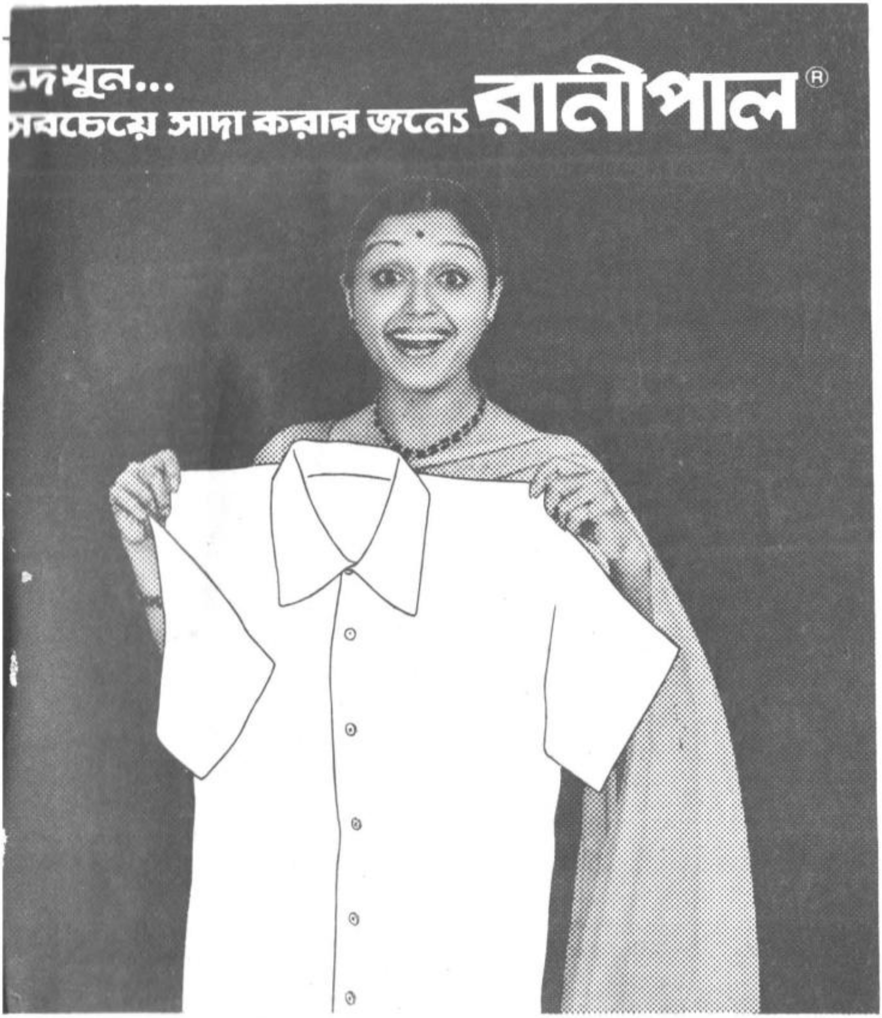

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই ।

নিয়মিত রানীপাল লাগান... আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল ®**
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের
জন্য **রানীপাল ® - এস**

Shilpi SG-2A/78 Ben

everest/79/PP/261-bn